পিতৃদেবের করকমলে

লেখকের নিবেদন

হাওড়ার 'যুবসভা' বর্তমান বৎসরে পঁচিশে বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া সাত দিন 'রবীন্দ্র সপ্তাহ' পালনের উদ্যোগ করেন এবং ঐ সপ্তাহের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রপ্রতিভার এক একটি দিক লইয়া আলোচনা করিবার জন্য মাদৃশ অখ্যাত ব্যক্তিকে আদেশ করেন। এই 'যুবসভা'র সভ্যদের নির্বন্ধাতিশয্যে এক মাসের অনধিক কালের মধ্যেই এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলির রচনা এবং মুদ্রণ কার্য শেষ করিতে হইয়াছে। 'যুব সভা'র আহূত 'রবীন্দ্র সপ্তাহ' উৎসবের বিভিন্ন বৈঠকে যোগদান করিয়া যাঁহারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীসোমনাথ মৈত্র এম্‌-এ, অধ্যাপক শ্রীপ্রভাস ঘোষ এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌, 'যুগবাণী'র সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ (রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ), শ্রীমন্মথনাথ সান্ন্যাল (সম্পাদক 'রবি বাসরীয়' আনন্দবাজার) শ্রীযতীন্দ্র সেন (আনন্দবাজার), শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুধাংশু কুমার সেনগুপ্ত এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি, কবি ও সঙ্গীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী এম-এ, শ্রীজিতেন সেন (বিশ্বভারতী), অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, এম-এ, এবং শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ—টাকার কথা) মহাশয়ের নিকট আমার ঋণ সর্বাধিক। বাঙ্গালার এই মনীষীদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা আমার নাই। 'যুব সভা' প্রবন্ধগুলি অনতিবিলম্বে গ্রন্থাকারে

প্রকাশ করিবেন শুনিয়া তাঁহারা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাঠক সমাজ এই গ্রন্থকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন জানিনা, কিন্তু আবির্ভাবমুহূর্তেই 'রবীন্দ্র মানস' তাহার অখ্যাত স্রষ্টার জন্য যে সম্পদ অপ্রত্যাশিতভাবে লইয়া আসিয়াছে তাহার তুলনা নাই, লেখকের তাহাই পরম উপার্জন।

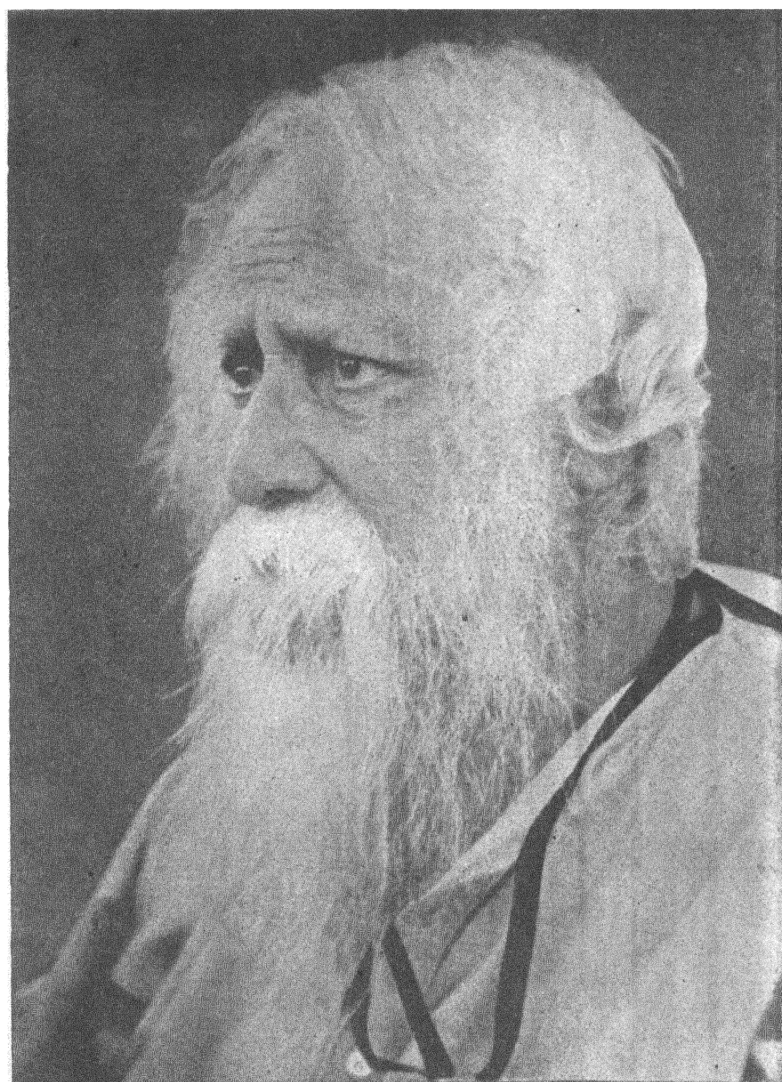
এই গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি. মহাশয় লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের কয়েকটি মন্তব্যের সমালোচনা করিতে হইয়াছে। সমালোচনার ভাষা দ্ব্যর্থহীন হওয়া প্রয়োজন. সেই কারণে কোথাও কোথাও এই প্রতি-বাদের ভাষা কঠোর হইয়া থাকিবে। ডক্টর সেনগুপ্ত আমার অধ্যাপক। অন্তরে যথেষ্ট পরিতাপ ও অপরাধবোধ লইয়াই শিষ্য হইয়া গুরুর উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছি। ছাত্র হইতে শিক্ষক পরাজয়ই কামনা করেন। অতএব তাঁহার গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা করিলেও তিনি যে আমাদের ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হইবেন না এবং আমাকে ক্ষমা করিবেন তাহা আশা করা আমার পক্ষে নিশ্চয় অন্যায় হইবে না। এই সুযোগে তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। অন্যান্য যে সকল লেখকের উক্তির প্রতিবাদ এই গ্রন্থে রহিয়াছে গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করি নাই, কারণ ঐ সকল উক্তি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নহে। কেবল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের একটি মন্তব্যের কথা এইখানে বলিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কাব্যখানা রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের মূল ধারা নহে এবং সেই কারণে ঐ কাব্যকে আমল না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় এই জাতীয় একটি মন্তব্য তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় স্থান পাইয়াছে। উল্লিখিত মন্তব্য যে রবীন্দ্র মানসকে, রবীন্দ্র প্রতিভাকে একেবারে না বুঝিবার লক্ষণ তাহা এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় (রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব সাহিত্য) পাঠ করিলেই পাঠক সম্প্রদায় বুঝিতে পারিবেন।

রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি হইলেও তাঁহার অনুভূতিগুলির উৎস এই দুই শতাব্দীর ভিতরে সীমাবদ্ধ নহে এবং

য়ুরোপের ভাবধারার সঙ্গে ইহাদের সমধর্মিতাও নাই বরং অনেকক্ষেত্রে বিরোধ রহিয়াছে। অন্যকারণ ছাড়াও কেবল এই কারণে পাশ্চাত্য সাহিত্যকে পাথেয় করিয়া রবীন্দ্র সাহিত্য পরিক্রমায় অগ্রসর হইলে রবীন্দ্রপ্রতিভার ভুল ব্যাখ্যার যে আশঙ্কা থাকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই গ্রন্থে দিয়াছি। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে যাহা প্রযোজ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কোন শাখা সম্পর্কে তাহা প্রযোজ্য। ভারত স্বাধীন হইয়াছে, এখন মনকেও একটু স্বাধীন করিয়া ইংরেজী কৌলীন্যের মোহ পরিহার করিয়া মাতৃভাষা, তথা মাতৃভূমির সেবার জন্য সরল সংস্কারমুক্ত চিত্তে সহস্র বৎসরের বাঙ্গালা সাহিত্য ও লক্ষাধিক বৎসরের ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী পণ্ডিতগণ যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলনে ও বিচার বিশ্লেষণে অগ্রণী হইতে পারিতেন তাহা হইলে বোধ হয় বাঙ্গালার ভাগ্যহত ছাত্রসমাজ দিন দিন অধঃপতনে যাইতেন না।

এই গ্রন্থপ্রকাশের জন্য হাওড়ার 'যুবসভা'র নিকট গ্রন্থকার ঋণী। এই গ্রন্থের আয় ঐ সভার সাহায্যের জন্য ব্যয় করিতে গ্রন্থকার সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

বাঙ্গালার তরুণদের এক বৃহৎ সমাজ আজ আদর্শভ্রষ্ট এবং সেই কারণে পরমুখাপেক্ষী। ইদানীন্তন কালে আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত অসংখ্য রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব যদি বাস্তবিক উদ্যোক্তাদের একপ্রকার কৌলীন্য-ভিক্ষাবৃত্তি ও বিষয়বুদ্ধি সঞ্জাত না হইত তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হইত। তরুণরাও কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথ যে-ভারতকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন সেই ভারতের স্বপ্ন আজ কি তরুণ কি বৃদ্ধ কাহারও চোখেই দেখিতেছি না। হাওড়ার 'যুব সভা' যথার্থ স্বদেশসেবার আদর্শ হইতেই রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি স্বদেশবাসীর প্রীতি জাগাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই সভার স্বদেশবৎসল অক্লান্ত কর্মীগণের আশা সফল হোক। 'রবীন্দ্র মানসে'র নিবন্ধগুলির বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া



রবীন্দ্র-মানস



কবির জীবন-দর্শন

(জীবন দেবতা)

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জীববিৎ ডারউইনের প্রজাতি তত্ত্ব (Origin of the Species) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য (Durwin's Bull Dog) Thomas Huxleyর কল্যাণে এই প্রজাতি তত্ত্বের উত্তাপ অখিল মানবের মনোভূমিতে দাবাগ্নি জ্বালাইয়া দিল। সকলেই মনে করিল ঐ ভূমির স্বভাবলালিত কোটি বছরের অতিবৃদ্ধ অশ্বত্থ তরুগুলির ধ্বংস এইবার কেহই রোধ করিতে পরিবে না। আত্মা, রস, (Sentiment) অতীন্দ্রিয়তা (Mysticism) উদ্গতি (Sublimation) রোচিষ্ণুতা (Romantincism) ইত্যাদিকে লইয়া মনঃ-স্বর্গবাসী ঈশ্বরের রাজ্যপাট বুঝি শেষ হইল। আসিলেন নূতন দেবতা,—কিম্ভূতকিমাকার—ভক্তেরা তাঁহার নাম দিলেন যুক্তিবাদ (Rationalism), তাঁহার পার্শ্বে অঘটন-ঘটন-পটীয়ান্ উপযোগবাদ (Utilitarianism) তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

একদা যে অন্তরবাসী অন্তর্যামীর সমুদ্ভাসিত সত্তার অস্তিত্ব হেতু মানুষ নৈসর্গিক বা জৈব-রাষ্ট্রের শাসন-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অবিনশ্বর ব্যক্তিত্ব মহিমাকে তাহার চরম ও পরম পরিচয় বলিয়া জানিয়াছিল সেই সহস্রশীর্ষা পুরুষকে ধূলায় লুন্ঠিত করিয়া এই নূতন দেবতা শিখাইলেন দেহাত্মবাদই পরম সত্য, অর্থাৎ পঞ্চভূতের রসায়ন প্রক্রিয়াই জীবন, যৌনধর্ম্মই পরমধর্ম্ম, ব্যক্তিত্বমহিমা (Egoism, Individualism) সুবিধাবাদিতার কপোলকল্পনা, গোষ্টিবাদই (Collectivism) বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব, ব্যক্তিবাদ কুসংস্কার, মানবের পূজার্হ দেবতা কোন সত্য-শিব-সুন্দর নহেন ; প্রকাণ্ড কাণ্ড অজস্র সৃষ্টি-নিয়ন্তা-স্বরূপ Life Force নামক শক্তিই একমেব দেবতা।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ববাদী, আকাশ-ছোঁয়া কল্পনা ও ভাব প্রবণতার স্তম্ভীভূত বিগ্রহ ওয়াটারলুর বধ্যভূমি হইতে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। তথাপি যুদ্ধ একেবারে থামিয়া গেল না, ওয়াটারলুর প্রান্তর হইতে নগরের পান্থ ও পানীয় শালায়, বিশ্রামাগারে, শিক্ষায়তনে, পণ্ডিত-মূর্খ সাহিত্যিক-অসাহিত্যিকদের মজলিসী ভবনে ছড়াইয়া পড়িল। এইখানেই পৃথিবীবিজয়ীর শেষ পরাজয় নির্দ্ধারিত ছিল। ভক্তি ও রোমান্স-ধর্মিতার রসবিগ্রহ, প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বাভিমানী, উদ্গতিকামী, নিঃস্বার্থ ব্যক্তিপুরুষ ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইলেন, জৈব-স্বার্থসর্ব্বস্ব Life Force নামক শক্তিধর উপযোগবাদ ও নির্ভেজাল যৌক্তিকতার ললাট টিকা পরিয়া পৃথিবীকে ঢালিয়া সাজাইতে বসিলেন। গোষ্টিবাদিতার ফলশ্রুতিস্বরূপ কম্যুনিজম্ বহুদিন পরে আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করিল,—রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এই দিক দিয়া স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরেই জর্জ বার্ণাড্ শ' নামক এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এই নূতন ধর্ম্মকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান করিলেন। ইনি বাস্তবতা, উদ্গতি ও রোমান্স-বৈরিতা, সমাজকল্যাণ, গোষ্টিকল্যাণ ও উপযোগিতার জয়ঢাক বাজাইয়া সাহিত্যের রসভূমিতে যৌক্তিকতার নামে মস্তিষ্কের মরুদাহ

ছড়াইয়া দিলেন। এই বৎসরই Widower's House প্রকাশিত হইল। পর পর দেখা দিল Arms And The Man, Candida, Life Force—ধর্ম্মতত্ত্বের নির্য্যাস Man and Super man ইত্যাদি।

অন্তরীক্ষে থাকিয়া বিধাতা বোধ করি হাসিলেন। মহাসাগরের এইপারে উদ্ধত ইউরোপের শাসনলাঞ্ছিত একখণ্ড ভূমির উপরে একখণ্ড ছিন্ন পত্র বাতাসে উড়িতে লাগিল। অতীব সাধারণ ঘটনা। কিন্তু কে জানিত একখণ্ড ছিন্ন পত্রকে ভেলা করিয়া ইউরোপ হইতে নির্বাসিত ঈশ্বর তাঁহার Mysticism, Romanticism ইত্যাদি দলবল লইয়া হঠাৎ কালের পারাবারে আবার তাঁহার পাড়ি জমাইবেন। একজন ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া ছিন্নপত্রটি কুড়াইয়া লইলেন। অস্তায়মান রবিরশ্মির স্তিমিত আলোয় চোখের সামনে পত্রখানি মেলিয়া ধরিলেন। দেখিলেন লেখা রহিয়াছে—ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনং। মন্ত্রটি বড় মনে ধরিল। গৃহে ফিরিয়া আপনার অতি প্রিয় পুত্রটির কানে কানে ইহাই বোধ করি বারংবার উচ্চারণ করিলেন। পুত্রটি লিখিলেন—

'আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান'

(গীতাঞ্জলি)

ইতিমধ্যে ইউরোপের বিজ্ঞানাগারগুলি হইতে বহু স্ফুলিঙ্গ অসংখ্য উল্কাপাতের মত পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই অগ্নিকণার একটু আঁচ ও ইঁহার শরীরে লাগিল না। কাব্যসৃষ্টি করিতে বসিয়া ইনি লবণাম্বুবারিধির ওপারে

তাকাইলেননা, Rationalism, Utilitarianismকে লইয়া Life Force ওপারেই পড়িয়া রহিল, নবযুগের বিদ্যুদ্-বহ্নির মধ্যে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ চিত্তের রাজহংসটিকে পাঠাইয়া দিলেন প্রাচীন হইতে ও সুপ্রাচীন আরণ্যক যুগের মানসসরোবরে। লিখিলেন—

"দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
একি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।
একি জ্যোতি, একি ব্যোম দীপ্ত দীপজ্বালা
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা।

* * * *

তোমারি মিলন শয্যা হে মোর রাজন
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত। ওগো বিশ্বভূপ
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ"

(দেহলীলা—নৈবেদ্য)

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে,.....................

* * * *

করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করিছে মহীয়ান।"

(প্রাণ—নৈবেদ্য)

জ্ঞাতে অজ্ঞাতে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সৃষ্টি প্রবাহ এই এক সত্যের কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে বলিলাম কারণ পরিণত বয়সে যে সত্য তাঁহার সমুজ্জ্বল জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, জীবনের প্রথম প্রভাতে ও অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাই প্রেরণা জোগাইয়াছে। তাঁহার শৈশবে যাহা ছিল জানা অজানা চেনা

অচেনার কুহেলিকা-ঘেরা স্বজ্ঞা (intuition) তাহাই ধীরে ধীরে বিচিত্র অনুভবের ভিতর দিয়া পূর্ণ চেতনার রাজ্যে স্বরূপে উদ্ভাসিত হইল।

সত্ত্বস্ত মায়া ও বিস্মৃতির অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে, স্থূল প্রকৃতির মায়াজালের ফাঁকে ফাঁকে যদিও তাঁহার দিব্যচ্ছটা একটু একটু আভাসিত হয় তথাপি যতদিন না এই জাল একেবারে ছিন্ন হয় ততদিন তার বিমল জ্যোতি সমুদ্ভাসিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই সত্ত্বস্তর সংজ্ঞা দিয়াছেন 'অতিরিক্ত মানুষ', Ego বা Personality। অদ্ভুত এই ব্যক্তিপুরুষ, ইনি একাধারে কবির অন্তরের সুখদুঃখাদি অনুভূতির উৎস ও ভোক্তা, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়।

'তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান'।

রবীন্দ্র মানসকে, রবীন্দ্র সৃষ্টিকে বুঝিতে হইলে ইহারই পরিচয় সর্ব্বাগ্রে জানিয়া লইতে হইবে। নতুবা তাঁহার কোন সৃষ্টিরই তাৎপর্য্য কিঞ্চিন্মাত্র অনুভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই তাঁহার সাহিত্য বিচারের পূর্ব্বে আমরা এই তত্ত্বটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ইন্দ্রিয় গ্রামকে সাধারণতঃ জ্ঞানের দ্বার বলা হয়। একটু স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলেই আমরা সহজেই বুঝিতে পারি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কত সীমাবদ্ধ। হস্তের দ্বারা জল স্পর্শ করিলাম, কিন্তু তাহাতে জলের জ্ঞান হইল কি? বলা যাইতে পারে 'ত্বক' নামক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আর দুইটি ইন্দ্রিয় 'চক্ষু' এবং জিহ্বা'র সাহায্য লইলেই ত 'জল' নামক পদার্থটির জ্ঞান আমরা পাইতে পারি। কিন্তু 'চক্ষু' 'জিহ্বা' 'ত্বগা'দি ইন্দ্রিয় জলের যে খণ্ড খণ্ড পরিচয় আমাদের অন্তর্লোকে বহন করিয়া লইয়া গেল সেইগুলি পৃথক পৃথক ভাবে যদি অবস্থান করে 'জল' নামক একটি পদার্থের সামগ্রিক জ্ঞান

হইতেই পারে না। 'ত্বক' জলকে স্পর্শ করিয়া বলিল ঐ বস্তু তরল (কঠিন পদার্থের স্পর্শের বিপরীত), 'চক্ষু' বলিল উহা বর্ণহীন, 'জিহ্বা' বলিল উহা স্বাদহীন,—এই কয়টি জ্ঞান অর্থাৎ 'তারল্য', 'স্বাদহীনতা' এবং 'বর্ণহীনতা'ই কি 'জল'? তাহা নহে। জল বলিতে বস্তুতঃ এই সকলই এবং তদতিরিক্ত আরও কিছু। তাহা হইলে কি করিয়া জলের জ্ঞান হইতেছে? হইতেছে, কারণ আমরা নিত্য ত্বগাদি ইন্দ্রিয়ের খণ্ড খণ্ড পরিচয়কে একটি সাধারণ সূত্রের দ্বারা একত্রীভূত করিয়া 'জলের' অখণ্ড পরিচয়কে গড়িয়া তুলিতেছি। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের খণ্ড খণ্ড পরিচয়ের ঐক্য সাধনের দ্বারাই বস্তুনিচয়ের জ্ঞান সম্ভব। কেবল তাহাই নহে, ঐক্য সাধনের পর আরও একটি কার্য্য সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। এই কার্য্য অন্য বস্তুর জ্ঞান হইতে এই বস্তুর জ্ঞানকে পৃথক করা। জলের জ্ঞান এবং অন্য বস্তুর জ্ঞান যদি একত্রে মিশিয়া যাইত তাহা হইলে আমাদের অন্তরে কোনটারই জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে পারিত না।

কিন্তু কে অন্তরে বসিয়া উল্লিখিত দুইটি কার্য্য আমাদের হইয়া করিয়া দিতেছে এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের খণ্ড খণ্ড পরিচয়কে অখণ্ডসূত্রে গ্রথিত করিয়া ও অন্য বস্তুর পরিচয় হইতে পৃথক করিয়া জ্ঞানকে অন্তরে উন্মেষ করিতেছে? ইনিই Personality, ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিপুরুষ, জীবাত্মা। ইঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছি ইনিই জ্ঞাতা, ইনিই যাবতীয় অনুভূতির উৎস। আবার এই অনুভূতি-গুলির রস আস্বাদম করিতেছে কে? ত্বগাদি ইন্দ্রিয় নিশ্চয় নহে। সুন্দর বস্তু দেখিয়া আমরা বলি 'চক্ষু' তৃপ্ত হইল। ইহা আলঙ্কারিক ভাষা মাত্র। সত্য কি 'চক্ষু'ই তৃপ্ত হইল? যদি তাহা হইত চতুষ্পদ জন্তু গোলাপ ফুল চিবাইয়া খাইত না। ইন্দ্রিয়াদি নিজেরা তৃপ্ত হয় না। আমাদের ভিতরের ব্যক্তিপুরুষকে তৃপ্ত হইতে সাহায্য করে মাত্র। অতএব যে ব্যক্তিপুরুষ আমাদের সমগ্র জ্ঞান ও অনুভূতির উৎস, তিনিই এই সমস্ত অনুভূতির ভোক্তা। রসের সামগ্রী তিনি নিত্য রচনা করিতেছেন, আবার নিত্য ভোগ করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবন দেবতা বলিতে মানুষের অন্তর্বাসী এই ব্যক্তিপুরুষ বা Personalityর কথাই বলিয়াছেন। ইঁহারই অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইতে গিয়া তাঁহাকে কলম ধরিতে হইয়াছিল।

"ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম।
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষা সম"

(জীবনদেবতা—চিত্রা)

গীতা ইঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন—

'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ,
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।'

আমি এই জগতের গতি, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং বীজ অর্থাৎ কারণ ও অবিনাশী।

(নবম অধ্যায় ১৮ শ্লোক)

"অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"

(ঐ ২৪ শ্লোক)

আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু।

কবির বক্ষ নিঙাড়িয়া সেই বক্ষের সকল রস সকল মধু ইনিই পান করিতেছেন, ইনিই যে প্রভু এবং ভোক্তা।

"কত যে বরণ, কত যে গন্ধ
কত যে রাগিণী কত যে ছন্দ
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর শয়ন তব—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা

তোমার ক্ষনিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্য নব।"

(জীবনদেবতা—চিত্রা)

Ego এবং Personality শব্দ দুইটি জড়বাদীরাও ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব মানেন না তাঁহারা Personality বলিতে কাহাকে বুঝাইয়া থাকেন? যদি কেহ বলেন—'রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমার ভাল লাগে'—তাহা হইলে কাহার ভাল লাগিতেছে বুঝিব? ত্বগাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের, না ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের? মনও জড় ইন্দ্রিয়। সেই কি রবীন্দ্র কাব্য উপভোগ করিতেছে? মনকে মনন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে কে? আবার মন যে মনে করিতেছে তাহাও বা জানিতেছে কে? জানিয়া সুখ বা দুঃখই বা অনুভব করিতেছে কে? সেই অনুভূতির তাৎপর্য্যই বা অন্তরে বসিয়া বিচার করিতেছে কে? অতএব 'আমি' বলিতে 'চক্ষু', 'কর্ণ,' 'নাসিকা', 'জিহ্বা', 'ত্বক' ও 'মন' ব্যতীত আর কেহ যিনি প্রকৃত জ্ঞাতা ও ভোক্তা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইনিই আবার সকল জ্ঞানের ভিত্তিভূমি।

'শ্যামলী' কাব্যের অন্তর্গত 'আমি' নামক কবিতাটিতে কবি এই 'আমি'র বা Personalityর কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। গীতা যাঁহাকে 'গতিঃ, ভর্ত্তা, প্রভুঃ, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণং সুহৃৎ, প্রভবঃ, প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্' বলিয়াছেন কবি যে তাঁহাকেই "আমি" বা Personality বা Ego বলিতেছেন এই কবিতায় তাহা একেবারে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠলো আলো
পূবে পশ্চিমে

গোলাপের দিকে চেয়ে বল্লুম, সুন্দর,
সুন্দর হল সে—
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্ব কথা
এ কবির বাণী নয়।"

কিন্তু কবির বাণী আর তত্ত্ব কথাতে বিভেদ নাই। রবীন্দ্রনাথের মতে এই বেদোক্ত তত্ত্ব বা সত্যই কাব্য। কাব্যের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব রসোত্তীর্ণ সামগ্রীতে পরিণত হয়, আনন্দের বিষয়ীভূত হয়, কেবল ইহাই ব্যবধান। অর্থাৎ কাব্য ও শাস্ত্রের ব্যবধান কেবল টেক্‌নিকের, ষ্টাইলের।

"আমি বলব, এ সত্য
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে"

কোথায় পশ্চিমের গোষ্টিবাদ, collectivism, রবীন্দ্রনাথ একেবারে সুপ্রাচীন Egoismকে রাজবেশে সাজাইয়া তাঁর স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। বলিলেন—

"মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বশিল্প।"

"আমি" বলিতে অন্তরের যে ব্যক্তিপুরুষটিকে আমরা লক্ষ্য করি Art বা কাব্য সেই ব্যক্তিপুরুষেরই অভিব্যক্তি, 'the expression of Personality'। তাহা হইলে বাহ্য জগৎ বলিতে কি কিছুই নাই? রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে-'র যে বস্তু জগৎ আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে তাহার কি স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই? তাহাও কি এই 'আমি' বা ব্যক্তিপুরুষ? মানুষের অহংকার পটেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প? "জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্? কবির অন্তর্লোকে জ্ঞাতারূপে ব্যক্তিপুরুষটি আছেন বলিয়াই বিশ্বকর্মার সৃষ্টির অস্তিত্ব রহিয়াছে। জ্ঞাতা 'আমি'ই যদি না রহিল জগৎ অস্তিত্বে জ্ঞান আর রহিল কোথায়? এখন প্রশ্ন হইবে এই জ্ঞাতা 'আমি' আর বিশ্বকর্মার

যে জগৎ বাহিরে ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কি এক বস্তু? অভিন্ন? অর্থাৎ আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক নামক পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং ষষ্ঠেন্দ্রিয় মন অহরহ বিশ্বকর্মার সৃষ্টির রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের যে স্পন্দন অন্তর্লোকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে এবং আমাদের অন্তর্বাসী জ্ঞাতারূপী যে ব্যক্তিপুরুষটি আমাদের অলক্ষ্যে সেই স্পন্দন-গুলিকে synthesis ও analysisএর দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানে পরিণত করিতেছে এবং সেই জ্ঞান ও স্পন্দনের উপলব্ধিজনিত পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছে সেই ব্যক্তিপুরুষ আর রূপ-রসাদির আধার বা ভিত্তিভূমিস্বরূপ বহির্জগতের বস্তুনিচয় কি এক? গীতা বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! তোমার অন্তর্বাসী ভোক্তা ও জ্ঞাতারূপী 'আমি'ই জগতের 'বীজ। অতএব জ্ঞাতা ও আমি, জ্ঞেয়ও আমি। আমিই জগৎ। সূত্র যেমন মনিনিচয়কে গাথিয়া রাখে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-রূপী জগৎ-সৃষ্টিকেও অন্তরালে থাকিয়া সূত্ররূপে আমিই গাথিয়া রাখিয়াছি।

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুনঃ,
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।"
(দশম অধ্যায়—৩৯ শ্লোক)

যাহা সর্ব্বভূতের বীজ অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, তাহা 'আমি', যেহেতু আমি ব্যতীত যাহা থাকে, এরূপ চর বা অচর ভূত নাই। অর্থাৎ আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"ওদিকে অসীম যিনি তিনি স্বয়ং
করছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়
তাকেই বলে "আমি"।
সেই আমির গহনে আলো আঁধারের ঘটল সংগম
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস;
'না' কখন ফুটে হল 'হা', মায়ার মন্ত্রে
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

রেখা-রঙ-সুখ-দুঃখের কজ্জলাঙ্কিত এই জগৎ সেই এক 'আমি'রই প্রকাশ। সসীম বস্তু জগতের অন্তরালে সূত্ররূপে 'আমি' 'অসীম'ই বর্তমান। এই 'আমি' তোমার মধ্যে ও ব্যক্তিপুরুষরূপে, অতিরিক্ত মানুষরূপে বাস করিতেছি। তাই এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছিলাম এই ব্যক্তিপুরুষই একমাত্র সদ্বস্তু।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর" (গীতাঞ্জলি)

রবীন্দ্রনাথের 'জন্মদিনে' নামক কাব্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতাতেই 'জগৎ' ও 'আমি'র এই রহস্য ভাষা পাইয়াছে।

"সত্তা আমার, জানিনা, কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্য ধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ মাঝে কেন্দ্র রচিল স্বীয়।
বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানিনা কে কৌতুকী।
ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
* * * *
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে
মুখ-ঢাকা বধূ সেজে
গলায় পরিয়া হার
বুদ্‌বুদ মণিকার।
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব।"

এই সৎবস্তুকে ('আমি'কে) চিনিবার নানা বাধা। তিনি যে চিন্ময় হইয়া ও গলায় বস্তুর বুদবুদ হার পরিয়া অন্তরে বাহিরে উঁকি দেন।

"সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনা সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।"

বস্তু-বুদ্‌বুদের রূপের অন্তরালে এই অনন্ত অরূপ বিরাজ করিতেছেন। বুদ্‌বুদের জাল ছিন্ন করিয়া বেড়ার বাধাকে অতিক্রম করিয়া আমার স্বরূপ সত্তা, পূর্ণ 'আমি', অনন্ত 'আমি'কে জানিতে হইবে।

এখন আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে উল্লিখিত কবিতাগুলির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব।

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রি দিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে সেই প্রাণ চুপে চুপে,
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে।
* * * *
করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্
সেই যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্ত্তন।"

তাহা হইলে সূত্ররূপে বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে এবং আমার মধ্যে যুগপৎ যিনি বাস করিতেছেন যাঁহাকে আমরা পূর্ব্বে Ego, Personality, ব্যক্তিপুরুষ, অন্তর্যামী, জীবনদেবতা ইত্যাদি নানা নামে ডাকিয়াছি, সেই সূত্রটি প্রাণ-সূত্র। প্রাণরূপী নারায়ণ সর্ব্বঘটে বিরাজমান থাকিয়া আপনাকে আপনি আস্বাদন করিতেছেন।

ইনিই 'সাক্ষী' অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুরূপ দ্রষ্টা, জ্ঞানচক্ষুরূপ অন্তর্দৃষ্টিতে ইনিই ইঁহাকে দেখিতেছেন। 'রক্ষক' ও ইনি কারণ প্রাণরূপে দেহে থাকিয়া সমস্ত ইনিই করিতেছেন। প্রাণের অভাবে কিছুরই অস্তিত্ব থাকেনা। ইনিই 'প্রভব' অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যাহা উৎপন্ন বা প্রকাশিত হইতেছে তাহাই, চঞ্চল প্রাণরূপে প্রভব অবস্থাও ইনি, 'প্রলয়'ও ইনি, অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণ যখন প্রকৃষ্টরূপে স্থিরে গিয়া মিশিতেছে ('হাঁ' যখন আবার 'না'এফিরিয়া যাইতেছে) সেই স্থির অব্যক্তরূপী প্রলয়স্থানও ইনি, ইনিই 'আধার' অর্থাৎ প্রাণরূপী ইহাতেই সর্ব্ববিশ্ব অবস্থান করিতেছে, আবার ঐ ইনিই ঐ অবস্থান-রূপ থাকিবার স্থান। "প্রাণ" বা কারণও ইনি কারণ প্রাণরূপী ইনিই বিন্দুরূপে জীবাণু। পঞ্চতত্ত্বাদিতে যুক্ত হইয়া ভূত-(বস্তু) রূপে ইনিই উৎপন্ন হন। গীতার এই তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত কবিতাগুলি পাঠ করুন। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইবে। এই অদ্বৈত তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন।

"চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে।"

(জন্মদিনে)

এই অব্যক্তের বিরাট স্রষ্টাই রবীন্দ্রকাব্য।

"আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোটো আর একদিকে অত্যন্ত বড়ো। যে দিকেটাতে আমি কেবল মাত্রই আমি—কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন আমার ইচ্ছা—যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সেদিকটাতে আমি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মতো ছোটো আর কে আছে! আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যেদিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শত সহস্র তেজ আলোকের নাভির সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে,—আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোক লোকান্তর পরম

আদরে এই কথা বলে যে, তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর কেউ নেই, অন্তরের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি ; সেইখানে আমার চেয়ে বড় আর কে আছে ! এই বড়োর দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটর দিকে কখনই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহঙ্কারের অতীত সেই আমার বড়ো-আমিকে সকলের চেয়ে 'বড়ো-আমি'র মধ্যে ধরে দেখিবার দিনই হচ্ছে আমাদের বড়ো দিন।

অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা আর কেউ তা নয়।

আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা। তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেল্‌ছে আর এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্ছে, এমনি করে আমি আর আমি—যার মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ারভাঁটা চল্‌ছে।·········বিশ্ব—আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ খেলাখেলি।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম আমির আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠ্‌ছে।"

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও উপনিষৎ

(বিশ্বদেবতা)

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি কবির সৃষ্টিপ্রবাহ এক সত্যের কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এই সত্যই তাঁহার জীবনবেদ। অন্তর্লোকে ধ্যানদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি যে জীবনদেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন সেই দেবতাই প্রাণরূপী নারায়ণ। রবীন্দ্র-কাব্য এই প্রাণারামের অনন্তলীলার মহাকাব্য।

"মনে আজি পড়ে সেই কথা
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে"।

(চঞ্চলা-বলাকা)

এই লীলার স্বরূপ কি? ডারউইন সাহেবের প্রজাতিতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের অরণ্যবাসী ঋষিরা ধ্যানের দ্বারা স্থানকালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এই বিশ্বে এক অজস্র বিকাশের ধারা। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মায়াজালের অন্তরালে প্রাণতরঙ্গিণী অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে, এই চলার অন্তও নাই, আদিও নাই, প্রাণের একটি ধারা নরদেহে বন্দী হইয়া ক্রমাগত অনন্তের সম্মুখীন হইতে চাহিতেছে। এই প্রাণই একদা কঠিন শিলারূপে পাষাণী অহল্যার ন্যায় ধরণীর বুকে মুখ লুকাইয়া ধরণীর মৌন বাণী শুনিয়াছিল। পুষ্পরূপে ইহাই ছুটিয়াছিল বৃন্তে বৃন্তে, কস্তুরী

মৃগের ন্যায় ইহাই ত আপন গন্ধে মত্ত হইয়া ছুটিয়াছিল বনে বনে, যুগে যুগে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে নিরুদ্দেশ যাত্রার আহ্বানে রূপ হইতে রূপে ইহাই ত বহিয়া আসিয়াছে।

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়,"
(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

ভারতের জন্মান্তরবাদ এই প্রাণের রূপান্তর বাদ। উপনিষদের ঋষির ইহাই ব্রহ্মানুভূতি। ভরতের অধ্যাত্মসাধনার এই আবিষ্কারের প্রমাণ কবি নিজের অন্তরের মধ্যেই পাইয়াছিলেন। তাই তিনি বলিলেন আমি কেবল বর্ত্তমানের ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহমাত্র নহি। অনাদিকালের ভাবের উৎস হইতে কোটি জন্ম পার হইয়া বারে বারে মৃত্যুস্নানে শুদ্ধ হইয়া আমিই চলিয়া আসিয়াছি। নবীন যৌবনে বারে বারে পরিশুদ্ধ হইয়া আমিই বিকশিত হইয়া উঠিতেছি। মৃৎ-পাত্রের মত এক জীবনেব সঞ্চয়কে অবহেলা করিয়া নব নব ভুবনে নব নব রূপে আমিই আবির্ভূত হইতেছি।

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"।

"যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
* * *
'রূপ হতে রূপে
প্রাণ হ'তে প্রাণে।"

অনাদি অনন্ত বিকাশের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। মৃত্যুর মধ্যে যাহার পরিসমাপ্তি কল্পনা করিতেছি তাহাই ভিন্ন দেহে, ভিন্ন রূপে আবার জন্ম নিতেছে। এ মহা জীবনে নিত্য মিলন এবং নিত্য বিরহ। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, অঙ্কুর পরিণত হয় বৃক্ষে, বৃক্ষপল্লব খসিয়া পড়ে, আবার সেই জীর্ণতার মধ্যে জন্ম নেয় নূতন অঙ্কুর, নূতম মুকুল, ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ জগৎ বৃক্ষটির ও এই একই ইতিহাস

কিন্তু কে এমন ভাবে জন্ম নিতেছে বার বার? বার বার মরিয়া অমর হইতেছে?

"যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই
তুমি তাই
পবিত্র সদাই
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে"
(চঞ্চলা-বলাকা)

কে এই চঞ্চলা নদী? অগণিত বিবর্তনের মাপে বারে বারে নূতন হইয়া আবির্ভূত হইতেছে?

উপনিষৎ বলিতেছেন

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনং।"

সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। অর্থাৎ জগৎ নামে যাহাকে অভিহিত করিতেছি তাহা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য যাহা আছে বলিয়া মনে করিতেছ তাহা তোমার ভ্রম বা অবিদ্যা। এই ভ্রম বা অবিদ্যা হইতেই তুমি এইখানে ঈশ্বর ছাড়া অন্য অনেক ভোগের বস্তু দেখিতেছি। বস্তুত উহাদের অস্তিত্ব নাই। অতএব এই সকল ভোগের লালসা ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরেই তোমার রতি হোক। অন্য কিছুতে লোভ করিও না।

অতএব উপনিষদের তত্ত্বানুসারে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের আধার স্বরূপ বস্তুনিচয় এবং তাহাদের লইয়া সমগ্র বিশ্ব প্রাণরূপী ব্রহ্মের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তাঁহাদের 'জগৎ' শব্দের ব্যবহারের মূলে রহিয়াছে বিবর্তনের প্রত্যক্ষজ্ঞান। যাহা চলিতেছে তাহাই জগৎ। বিশ্বচরাচর এক পুলকিত অথচ নিরঞ্জন সত্তার অজস্র বিকাশের ধারা। ব্রহ্মা যেন এক জ্যোতির্ম্ময় পদ্ম অবিরাম অনন্তকাল আপনার দল অপনি বিকাশিত করিতেছেন।

"জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা
খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস সরোবরে—
সূর্য্যতারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়
ফুলে ফুলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।"

(বলাকা—৩৩)

"একোঽহং বহুস্যাম্" বলিয়া যিনি নিজেকে কোটি সৃষ্টির মাঝে বিলাইয়া দিতেছেন, রূপ হইতে রূপে প্রাণ হইতে প্রাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া আপনার মাধুরী তিনি আপনিই অনুভব করেন। জগতে আলোর মঞ্জরী তিনিই ছড়াইয়াছেন, তিনিই আবার অঞ্জলি পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এই সত্যের মুখোমুখী হইয়া কবি উপলব্ধি করিলেন যিনি তাঁহার জীবনদেবতা তিনিই বিশ্বদেবতা।

তাঁহার অন্তরে বিচিত্র অনুভূতির তরঙ্গ তুলিয়া যে প্রাণ উদ্বেলিত হইতেছে তাহাই অখিলরসামৃতের ঋতুরঙ্গলীলা।

'বলাকায়' কবি বলিতেছেন তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিলেন পথ ঊর্দ্ধমুখে পথিককে ডাকিতেছে, পর্ব্বত চাহিতেছে বৈশাখের মেঘ হইতে, অন্তহীন দূরের সর্ব্বনাশা প্রেমে উন্মত্ত হইয়া অভিসারে চলিয়াছে নদী।

"মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;

তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দ রেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।"

(বলাকা)

'ছবি' নামক কবিতাটিতে তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন নির্জীব ছবি বলিতে জগতে কিছুই নাই, বস্তু বলিতে কিছুই নাই। আছে কেবল প্রাণ, একমাত্র প্রাণই সত্য। বিশ্বচরাচর এই সদ্বস্তুর অখণ্ডলীলা।

"তুমি ছবি ?
নহে নহে, নও শুধু ছবি।"

প্রাণ শাশ্বত, শাশ্বত প্রাণের লীলা। তাই মৃত্যু মিথ্যা। মিথ্যা

"কে বলে, রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।"

এই শাশ্বত লীলা যদি কখনো থামিয়া যাইত তাহা হইলে অনন্ত অখিল এই বিশ্বছবিখানাই ত মুছিয়া যাইত।

"মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।

পাষাণের মধ্যে ও এই প্রাণের সন্ধান পাইয়া কবি লিখিতেছেন।

"কে তোমারে দিল প্রাণ,
রে পাষাণ।
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ।"

কিন্তু যে পাষাণকে বস্তু বলিয়া জানিতাম, যে পর্ব্বতকে স্থাণু বলিয়া মনে করিতাম তাহাদের মধ্যে ও প্রাণের এই যে লীলা, তাহাদের লইয়া সারা বিশ্বের এই যে অবিরাম গতি, এই লীলার,

এই গতির লক্ষ্য কি? নিরুদ্দেশ যাত্রা কি সত্যই অনির্দ্দিষ্ট, লক্ষ্যহীন? বিশ্বের অণুপরমাণুটিও যেন স্থির থাকিতে চাহিতেছে না, তাহারা যেন ডাকিয়া বলিতেছে

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

কিন্তু সেই 'অন্য কোথা' কোথায়?

উপনিষদের ঋষি এক পরম ধাম আবিষ্কার করিয়াছিলেন প্রকাশিত জগতের শেষ আশ্রয় সেই পরম ধামের পরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নমা বিদ্যুতে। ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

(কঠোপনিষৎ)

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ
যদ্গত্বা নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামঃ পরমং মম।"

(গীতা)

বিশ্বরূপ 'বলাকার' অবিরাম চলার লক্ষ্য এই স্বর্গ, এই পরমধাম, যেখানে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, অগ্নি নাই, অন্য জ্যোতিষ্ক নাই, অথচ যাহা চির ভাস্বর।

"স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই।
তার ঠিক ঠিকানা নাই।
তার আরম্ভ নাই, নাইরে তাহার শেষ,
ওরে নাইরে তাহার দেশ,
ওরে নাইরে তাহার দিশা,
ওরে নাইরে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।"

(বলাকা-২৪)

যোগীরা ব্রহ্মকে এই ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আপনার জ্যোতিতে আপনি জ্যোতিষ্মান্ তিনি। এই ব্রহ্মলোকে সূর্য্য

নাই, চন্দ্র নাই। অর্থাৎ জন্মমৃত্যু উদয়াস্তের বিবর্তন এইখানে আসিয়া নিরঞ্জন ব্রহ্মসত্তাতে লয় হইয়াছে। থামিয়া গিয়াছে পাখার চঞ্চলতা। প্রকাশিত বিশ্বরূপ বলাকাটির নিরুদ্দেশ যাত্রার ইহাই উদ্দেশ।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তা জড় দেহে ধরা দিয়াছে। সূক্ষ্ম হইয়াছে স্থূলের আবরণে প্রকাশিত। অন্তরস্থিত প্রাণরূপী সূক্ষ্ম সত্তা সূক্ষ্মব্রহ্মে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে। তাইত মৃত্তিকার প্রতি তৃণ, প্রতি অণু পাখা মেলিয়া এই অমৃতলোকের পানে ধাইয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই পদার্থবিদ্ জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের ন্যায় পদার্থের পরমাণুতে গতির আবেগ দেখিয়া জড়ত্বের মহিমা কীর্তনে মুখর হইয়া উঠেন নাই। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন গতির অন্তরালস্থিত সেই নিরঞ্জন নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার এক কথায় গুণাতীত সত্তাকে, যিনি সূত্রের ন্যায় জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

ভারতের মনীষা প্রকৃতির মধ্যে গতির আবেগ দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের ঋষিরা গতিবাদী ছিলেন না। তাঁহাদের মতে গতি বিকারমাত্র। সত্য অবস্থার বিকৃতি। স্বরূপ নহে। গতিকে স্থিরে ফিরাইয়া নেওয়াই সাধকের লক্ষ্য। সীমা যখন অসীমে লীন হইবে. প্রকৃতির গতি চঞ্চলতা তখনই থামিয়া যাইবে। অপূর্ণতাই চঞ্চলতার কারণ, সকল বিক্ষোভের মূল। অপূর্ণ জগৎ যখন পূর্ণ ব্রহ্মে লয় হইবে তখন চাওয়া-পাওয়া, উদয়াস্ত, জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তন থাকিবে কোথায়? সৃষ্ট জগৎ পরম ব্রহ্মের একাংশে ধৃত রহিয়াছে। এজগতের ত্রিপাদ অমৃত লোকে। অর্থাৎ চরাচর যতখানি আমাদের চোখে বা কল্পনায় ভাসিতেছে তাহা তাহার অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাই অপূর্ণ। তাই সে তাহার পূর্ণতাকে পাইবার জন্য নিত্য অভিসারে চলিয়াছে সেই অমৃতলোকে পানে। সেই অমৃত লোকেই তাহাকে নিত্য ডাকিতেছে।

গতির গান গাহিতে গিয়া বলাকার কবি বার বার বিশ্বের এই অদেখা, অচেনা অমৃতলোকের আহ্বানের কথা বলিয়াছেন। এই আহ্বান শুনিয়াছে বলিয়াই বিশ্বের দৃষ্টি সদা উর্দ্ধমুখী। কবির হৃদয়ের মানুষটিও যাহা দেখিয়াছে তাহা হইতেও বেশী করিয়া দেখিতে চাহিতেছে যাহা দেখে নাই, দেখা যায় না। সারা বিশ্বে কার উদার ইঙ্গিত ভাসিয়া আসিতেছে, স্মরণের দূর পরাপার হইতে, কোটি জন্মের অতীত হইতে কার কণ্ঠস্বর যেন কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

"এই ক্ষণে
মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন বাতায়নে
যে-তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত আলোতে
সে-তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
রহিয়া রহিয়া
চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সঙ্গীত,
নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।"

বিশ্ব-বিভুর এই বিচিত্র লীলা। কোটি সৃষ্টির মাঝে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া আবার সেই সৃষ্টিই নিরীক্ষণ করিতেছেন, নিজে অন্তরীক্ষে সংগোপনে থাকিয়া আকুল ইশারায় ইহাকেই আবার ডাকিতেছেন। এ যেন আপনার সাথে আপনার বিরহ।

"আজি মনে হয় বারে বারে
যেন মোর স্মরণের দূর পর পারে
দেখিয়াছে কত দেখা
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, এত একা।
সেই সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে
ঘাসে ঘাসে নিমিষে নিমিষে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক ঝলক ঝিকিমিকে।

*   *   *   *

তাই আজি নিখিল গগনে
অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝংকারি উঠিছে অহরহ
তাই যা দেখিছ তারে ঘিরিছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড়।”

(বলাকা-৪০)

এই অদেখা পরিপূর্ণ সত্য কখনো কি দেখা দিবে না? বিশ্বের এই বিরহ কি শাশ্বত? অপূর্ণ চঞ্চল, বিরহদগ্ধ জগৎ তাহার অনন্ত সভায় কখনো কি পৌছিবে না? পৌছিবে: বহুজন্ম পার হইয়া প্রসুপ্ত জীবাত্মা মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া চৈতন্যের সন্ধান পাইয়াছে. পাষাণের মধ্যে ও প্রাণ (জীবাত্মা) ছিল, কিন্তু সেইখানে সে ছিল সুপ্ত। মনুষ্য শরীরে সে জাগ্রত, তাই সে এক জীবনে অনন্ত জীবনের স্পন্দন শুনিতেছে। এই মনুষ্য শরীরেও জড়ত্বের যে আবরণটুকু রহিয়াছে তাহাকে যেদিন সে সরাইতে পারিবে সেইদিন পূর্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া সে আপনার পূর্ণ মহিমায় লীন হইবে।

“মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্য সীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?”

(বলাকা-৩৭)

‘পূরবী’র অন্তর্গত ‘তপোভঙ্গ’ কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন. বিশ্ব বিভুর লীলার তাৎপর্য এই যে রূপরসের শতদলে একবার তিনি নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন, আর বার সেইরূপ নিজের মধ্যে সংহৃত করিয়া লইতেছেন। বিশ্বসৃষ্টি এক ভোলা সন্ন্যাসীর অশেষ ছলনা। এই সন্ন্যাসী ফুলধনুকে তৃতীয় নেত্রের তেজে বার বার দগ্ধ করিয়া বার বার উজ্জ্বলতর করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন। যৌবন বেদনারসে উচ্ছল দিনগুলিকে একবার শ্বেত রক্তনীলপীত ইত্যাদি নানা রঙের পুষ্পদলের মত সাজাইয়া আপনার জটাজালে গাথিয়া লইতেছেন, আবার ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসীর মত সেই নানা বর্ণের দিনগুলিকে আপনার

মধ্যে সংহত করিয়া লইতেছেন। এইরূপ নিত্য সৃজনে নিত্য প্রলয়ে বিশ্ব-বিধাতার সৃষ্টি রহস্যময়।

"জানি জানি এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নিত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান দুরন্ত উল্লাসে,
বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্রবেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।"
"হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব ছদ্মরণ-বেশে
বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।"

ভারতের দেবতা ভোলা সন্ন্যাসী আপনাকে আপনি এম্‌নি রূপ রসের সহস্র শতদলে ফুটাইয়া পলে পলে নূতন করিয়া নিজেকে উপলব্ধি করেন। এই প্রকাশ ও প্রলয়রূপ ছলনাতেই তাঁহার দুরন্ত উল্লাস।

"সেদিন ঐশ্বর্য তব উন্মেষিল নব নব
অন্তরে উদ্বেল হ'ল আপনাতে আপন বিস্ময়।"

নিজের ঐশ্বর্য নিজে উন্মেষিত করিয়া নিজেই তিনি বিস্মিত হইতেছেন।

মৃত্যু মৃত্যু নহে, বারে বারে নূতন হইয়া আবির্ভূত হইবার ছলনা মাত্র। বিচ্ছেদের ছলনায় উমাকে কাঁদান তিনি কেবল নূতন উৎসাহে তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবেন বলিয়া। বিচ্ছেদ মিলনে পরিণত হইতে বিলম্ব হয়না, মৃত্যুর কঙ্কালের উপর আবার জীবনমঞ্জরী দেখা দেয়। চিতাভস্ম হঠাৎ পুষ্পরেণুতে ঢাকা পড়ে, অস্থিমালা ঢাকা পড়ে মাধবী-বল্লরীতে।

পৌরাণিক দেবতা মহাদেবের সঙ্গে নানা কল্পনা জড়িত আছে। একবার তিনি কামের দেবতা মদনকে তৃতীয় নেত্রের তেজে ভস্ম করিয়াছিলেন, কারণ মদন তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে গিয়াছিল।

পুরাণের আখ্যায়িকাগুলি রূপক রচনা। ইহাও তাই। কবি তাঁহার কাব্যে একই রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এইখানে কবি বলিতে চাহিতেছেন বিধাতা এক এক সময় সৃষ্টির কামনা পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহাকে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী রূপে কল্পনা করা যায়। সৃষ্টি-কামনাকে যে মুহূর্তে তিনি ত্যাগ করিলেন সেই মুহূর্তে অখিল চরাচররূপ ব্রহ্মাণ্ডখানা একেবারে মুছিয়া গেল, রূপ-রস-শব্দগন্ধ-ময় জগৎ অরূপে ফিরিয়া গেল। ইহাই প্রলয়ের অবস্থা। সৃষ্টিকে যদি স্রষ্টার প্রেয়সী বলিয়া কল্পনা করা যায় তাহা হইলে এই প্রলয়কালে প্রেয়সীর সাথে প্রিয়ের বিচ্ছেদের অবস্থা। উমা বা পার্বতী সৃষ্টির রূপক। এই সময়ে সৃষ্টির ইচ্ছা বা কাম একেবারে ভস্মীভূত, এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। আবার বিশ্বদেবতাকে যদি একজন রাখাল বলিয়া কল্পনা করি তাহা হইলে প্রকাশিত জগৎ, যেখানে দিনরাত্রি হইতেছে, অসংখ্য জ্যোতিষ্ক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার ধেনু। এই ধেনু এক একবার রাখালের গোষ্ঠে ফিরিয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী নহে। সৃষ্টি-রূপিণী প্রেয়সীর বিরহ তিনি বহুকাল সহ্য করিতে পারেন না। তাই আবার "না" "হা" হইয়া উঠে। ব্রহ্মার অন্তরে আবার জাগে সৃষ্টি কামনা ভস্মীভূত মদন আবার জীবন লাভ করে। স্রষ্টারূপ হর সৃষ্টিরূপিণী পার্ব্বতীর সঙ্গে আবার মিলিত হন।

"ভৈরব, সেদিন তব প্রেত সঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে, তব শুভ্র তনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্যরুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবীবল্লরী মূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু—চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।"

বিশ্বের জীবন মৃত্যুর প্রবাহের মধ্যে কবি যেন এই অনির্বচনীয় সৃষ্টি-লীলা একেবারে প্রত্যক্ষ করিলেন। সৃষ্টি যেন তার গোপন ইতিহাস হঠাৎ কবির চোখের দুয়ারে মেলিয়া ধরিয়া তাঁহাকে এই ইতিহাস, এই সৃষ্টির গান লিখিয়া লইতে বলিল।

"কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে—
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে
কবির পরাণে।"

"নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা" নামক কাব্যখানিতে কবি বলিতেছেন নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর একপদক্ষেপের আঘাতে বহিরালোকে রূপ-লোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়। তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরালের রসলোক উন্মেষিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধন মুক্ত হয়।

ইহার বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব।

এইখানে কেবল বলিয়া রাখা আবশ্যক রবীন্দ্রনাথ অন্তরে বাহিরে এই লীলারস পান করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য এই রসেরই অজস্র ঊর্ম্মিমালা। বিশ্বের গতিছন্দই কবির মনে নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের কল্পনা জাগাইয়াছে। গতির ছন্দে বহির্বিশ্বে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-পত্র-পুষ্পের লীলাকমল ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার অন্তর্লোকে রস-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। অসীম এমনি ভাবে অন্তরে বাহিরে আপনার অস্তিত্ব মহিমা ছড়াইয়া দিতেছেন।

"নৃত্যের বশে সুন্দর হোল
বিদ্রোহী পরমাণু
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু।"

কবি বলিয়াছেন বিশ্ব বিধাতার সৃষ্টির এই নৃত্যচ্ছন্দ অন্তরে যখন সুর ভরিয়া দেয় তখনই আমাদের অন্তর্যামী জীবন দেবতা অখিল রসামৃতসিন্ধু বিশ্ব দেবতার সঙ্গে মিশিতে চাহে।

ইহাই মনুষ্য-ধর্ম্ম। ইহাতেই তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। মনুষ্যেতর জীবজন্তুর সাথে মানুষের প্রভেদ এই যে প্রকৃতির বন্ধন অতিক্রম করিয়া, স্থূলের, জড়ত্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষ আপন আত্মাতে

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্পর্শ অনুভব করে এবং তখনই তাহার কাছে প্রতিভাত হয় জগৎ ব্রহ্মময়।

ইহাতে পদে পদে বাধা। স্থূলবস্তু বাধার বিন্ধ্যাচল গড়িয়া চিন্ময় সত্তার ভাস্বর দ্যুতিকে নিরন্তর আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাতেই চৈতন্যের সাথে জড়ত্বের বাধে সংগ্রাম। কবি চিত্ত আপন স্বাধর্ম্ম্যে সেই বাধাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

"যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভবে।"

(সেঁজুতি)

"হে বসুধা
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে—যে তৃষ্ণা, যে ক্ষুধা
তোমার সংসার রথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছ রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে,
নানাদিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল কমে
ছুটির গোধূলি বেলা তন্দ্রালু আলোকে।

* * * *

কিন্তু জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারেনা ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে

* * * *

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে পেয়েছে সে "ভালোবাসিয়াছি"।

সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার।”

(জন্মদিন—সেঁজুতি)

খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য পরম চিন্ময় সত্তার উপলব্ধির অন্তরায়। খণ্ড সৌন্দর্য অখণ্ড সুন্দরকে আমাদের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখে। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যকে বুঝাইতে গিয়া উপনিষদের একটি উপমার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকে যদি একটি মহাসাগর বলিয়া কল্পনা করা যায় তাহা হইলে প্রকাশিত জগৎ—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-ময় বস্তুনিচয়, সেই সাগরের উর্মিমালা। উর্মিমালা সত্য, কারণ তাহারা সাগরেরই অঙ্গ; তাহারা মিথ্যা, কারণ তাহারা পূর্ণ ত নহেই, বরং তাহাদের রূপটাই ছলনা, তাহাদের পৃথক কোন্ সত্তা নাই। তাহারা চোখের সাম্‌নে নৃত্য করিয়া কেবল সাগরের অনন্ত সত্তাকে গোপন করিয়া রাখিতেছে। সেইরূপ জগতের খণ্ড সৌন্দর্য্য তখনই সত্য, যখণ তাহাকে অখণ্ডের সঙ্গে এক করিয়া দেখি। অন্তের পূর্ণতা অনন্তের মধ্যে, অনন্তই তাহার প্রকৃত রূপ বা স্বরূপ। পুষ্পে, গন্ধে, নক্ষত্রকিরণে, সূর্য্যের সপ্তবর্ণ মহিমায়, শিশুর হাসিতে, বন্য হরিণীর চকিত চাহনিতে, নারীর চোখের বিন্দুতে, নির্ঝরের বুকে প্রতিফলিত চন্দ্রমার লাবণ্যে, বলাকার উদ্দাম গতিতে, নদীর অকারণ অবারণ চলার ছন্দে, সৌন্দর্য্য ঠিকরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য তরঙ্গগুলি উচ্ছ্রিত সাগর উর্ম্মির মত ততক্ষণ অর্থহীন যতক্ষণ ইহাদিগকে অনন্ত, চির সুন্দর ব্রহ্মের সাথে এক করিয়া দেখিতে না পাই। এই খণ্ড সৌন্দর্য্যকে বেদান্ত বলিয়াছে মায়া, কারণ পৃথক সত্তা যদিও ইহার নাই, তথাপি ইহাকেই সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। (জড়বাদীদের তত্ত্ব এই ভ্রম হইতেই উৎপন্ন; কেবল তাহাই নহে, এই সৌন্দর্য্যের তরঙ্গমালা চোখের সামনে দাপাদাপি করিয়া অনন্ত সাগররূপ সত্য সনাতনকে দেখিতে দেয় না। অন্ধ হস্তী দেখিতে গিয়া যেমন তাহার এক একটি প্রত্যঙ্গের ধারণা লইয়া আসে, অন্ধ জড়বাদীও জগতের মধ্যেই জগতের শেষ দেখিতে পায়।

"তোমার সৃষ্টির পথ
রেখেছে আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনা ময়ী ?"
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছে নিপুণ হাতে সরল জীবনে"

(শেষ লেখা)

কিন্তু কবির সত্য দৃষ্টিকে ত ভুলানো যায় না, তাই আবার তিনি বলিতেছেন—

"তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়—
সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চির স্বচ্ছ।
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।

চিরভাস্বর জ্যোতিষ্ক সূর্য্যকে এই বলিয়াই উপনিষদের ঋষি বন্দনা করিয়াছিলেন। খণ্ড সৌন্দর্য্য যাহার ঊর্মিমালা মাত্র তাহাকে এম্‌নি দেখা যায় না। কিন্তু ভাস্বর সবিতা আভাসে সেই জ্যোতির্ম্ময়ের ইঙ্গিত দিতেছেন। তাঁহার বহিরাবরণের তেজের অন্তরালে এই তেজোতীত জ্যোতিষ্মান বিরাজ করিতেছেন। তাই সেই পূষণ একাকী বিচরণকারী প্রজাপতিতনয় সূর্য্যকে ঋষি ডাকিয়া বলিতেছেন, আপনি কিরণসমূহ সংবরণ করুণ। তেজ উপসংহার করুণ, আপনার যাহা অতি সুশোভনরূপ তাহাই আমি আপনার কৃপায় দর্শন করিব। যিনি আদিত্য মণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ আমি যে তাঁহা হইতে অভিন্ন।

"পূষন্নে, কর্ষে যম সূর্য্য প্রজাপত্যব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোহ সাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।"

(ঈশোপনিষৎ)

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিত মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃনু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।"

(ঈশোপনিষৎ)

জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে। অর্থাৎ মুখ্য স্বরূপটি অজ্ঞের নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে। হে জগৎ পরিপোষক সূর্য! সত্যধর্ম্মা! (অর্থাৎ তদাত্মভূত) আমার উপলব্ধির জন্য আপনি উহা অপসারিত করুন, তাহা হইলেই জানিব 'সোহহমস্মি'। সূর্যের এই অতি সুশোভনরূপ যে জানিয়াছে বাহ্যিক রূপের শত ছলনা তাহাকে ভুলাইতে পারেনা।

"সত্যকে সে পায়
আপন আলোক ধৌত অন্তরে অন্তরে।"

(শেষ লেখা)

খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে সে প্রত্যক্ষ করে।

"কিছুতে পারেনা তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তাহার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

(শেষ লেখা)

"জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর অনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে………"

এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই খণ্ড সৌন্দর্যের লীলারস, 'বলাকা'র অবিরাম নৃত্য ছন্দের মাধুরী পান করিয়াও কবি বলিয়াছেন—

"শান্তি সত্য শিব সত্য
সত্য সেই চিরন্তন এক।"

(বলাকা—৩৭)

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব সাহিত্য

কবির যিনি অন্তর্যামী জীবন দেবতা তিনিই বিশ্বদেবতা আত্মারূপে-প্রাণরূপে চরাচরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। যিনি Immanent, তিনিই Transcendent, তাই মর্ত্য নিরন্তর অমৃত লোকের দিকে অভিসারে চলিয়াছে, বস্তু ভাবরাজ্যে অভিগমন করিতেছে; এই অদৃশ্য অভিসারের লীলারস কবির অন্তরের রসলোককে মথিত করিয়া অমিয়া ছাকিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্র কাব্য যে সেই দুর্লভ অমৃত তাহাই প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদে আমরা দেখাইয়াছি।

মর্ত্তের স্থূলরূপ অবলুপ্ত হইয়া যখন বিদেহী ভাবমূর্ত্তিটি স্বরূপে প্রকাশ পায় তখন সাধক বলিয়া উঠেন—আমিই তিনি। কবি ও রূপের অন্তরের এই অরূপকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

সেই অরূপের লক্ষণ কি? রস বৈঃ সঃ। তিনি রূপ নহেন, সুখ নহেন, দুঃখ নহেন, তিনি রস, তিনি আনন্দ। কোন মানুষী অনুভবের নামের দ্বারা তাঁহার স্বরূপকে পরিচিত করান যায়না। কেবল নেতি নেতি করিয়া আভাস দেওয়া যাইতে পারে তিনি আমাদের অনুভব-সাধ্য কোন সত্তা নহেন; তিনি পূর্ণ, তিনি আনন্দ।

বৈষ্ণব ধর্ম বলিয়াছে তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু। মানুষের আত্মরূপিণী প্রবাহিনী নিরন্তর সেই রসামৃত সিন্ধুর উদ্দেশে অভিসারে চলিয়াছে। হৃদিনিকুঞ্জ নিবাসিনী মহাভাব স্বরূপিনী বিরহিনী শ্রীরাধিকা তাই নিত্যকাল উন্মাদিনীর ন্যায় বৃন্দাবন-বিহারীর পন্থানুবর্তিনী।

ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে ভারতের বৈষ্ণব ধর্ম এবং উপনিষদের অদ্বৈত তত্ত্বের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। মূলে কোন ব্যবধান আছে বলিয়া আমাদের চোখে পড়েনা। কিন্তু বৈষ্ণব

সাধকেরা বলিয়া থাকেন অদ্বৈত বাদকে মানুষের আচরণীয় ধর্ম বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের তত্ত্বের তাৎপর্য এই যে সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক জাতীয় বটে কিন্তু অভিন্ন নহেন। সৃষ্টির অন্তরের সুমহান অনুভব (আত্মা, মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধা) ঈশ্বরাভিমুখী, কারণ উহা তাঁহারই রসলীলার প্রকাশ, কিন্তু উহা কার্য, কারণ নহে। সর্বকারণ-কারণ কৃষ্ণ (পরমেশ্বর) সৃষ্টির আন্তরসত্তাকে (শ্রীরাধাকে) নিরন্তর তাঁহার বৈকুণ্ঠের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন···বিশ্বব্যাপ্ত তাঁহার নূপুরনিক্কণ, তাঁহার মূরলী ধ্বনি তাহাকে ডাকিতেছে। এই ডাকে সাড়া দিতে পারিলেই মানুষের স্থূল কামনার বন্ধন ছিন্ন হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা উৎসারিত হয়। রাধা ঘরের বন্ধন উপেক্ষা করিয়া নিশীথ রাত্রে বৃন্দাবনের পথে বাহির হইয়া পড়েন।

সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টিরূপিনী রাধা এবং স্রষ্টারূপী কৃষ্ণের এই লীলা বৈচিত্র্যকে ভাষা দিয়াছে।

বৈষ্ণব শাস্ত্র কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া কল্পনা করেনা। অবতার দেবতা হইলে ও নরদেহধারী। তাঁহাদের কল্পনায় 'কৃষ্ণস্তু ভগবানস্বয়ম্', আর এই বিশ্বচরাচর তাঁহার 'তনুভা', দেহকান্তি (idea ?)। সৃষ্টি ও স্রষ্টার এই দ্বৈত কল্পনা হইতেই ভক্তি এবং গাঢ়ভক্তির রসোল্লাস বা প্রেমের উৎপত্তি।

স্তরভেদে এই প্রেমকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচভেদে ভাগ করিয়া দ্বৈততত্ত্বানুরাগী বৈষ্ণব মহাজনেরা পদ রচনা করিয়াছেন।

'বলাকার' পূর্বযুগের রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্যে এই বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার এই যুগের অধ্যাত্ম চেতনায় দ্বৈতবুদ্ধি (Duelism) লুপ্ত হইয়া তখন ও অদ্বৈত তত্ত্বের (monism) সাড়া জাগে নাই। জাগিলেও তাহা ক্ষীণ। তাই এই রচনা গুলিতে ভক্তি এবং আত্মনিবেদনের সুরটি বেশী ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

"তবে তাই-হোক, হোয়োনা বিমুখ—দেবী তাহে কিবা ক্ষতি,
হৃদয় আকাশে থাকনা জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনা মলিন আঁখিকলঙ্ক ছায়া ফেলিবেনা তায়,
আঁধার হৃদয় নীল উৎপল চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।"

(সুরদাসের প্রার্থনা—মানসী)

ভক্ত বৈষ্ণব পার্থিব কামনা বাসনাকে হরিপ্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া চরিতার্থ হন। হরিগত-প্রাণ সুরদাস ও পার্থিব প্রিয়ার মাটির দেহকে হরিপ্রেমে রঞ্জিত করিয়া দেবতাকে তাঁহার মধ্যে আবিষ্কার করেন।

"রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরি পূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ"॥

কৃষ্ণপ্রীতির ইহাই লক্ষণ। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের এই ভাবটিই 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই প্রেম। বৈষ্ণব সাহিত্যের এই কৃষ্ণ কখনো বংশীরবে, কখনো নূপুর নিক্কণে মধুর বৃন্দাবন-বিপিনকে আলোড়িত করিয়া কৃষ্ণপ্রেম প্রতিমারূপিনী গোপিনীদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছেন, কখনো তাহাদের 'হাসি কান্নার ধন' এই কাণ্ডারী তাহাদের জীবন যৌবনের পসরা লইয়া (ভক্তি মাখা চিত্ত) নীল যমুনার উজানে পাড়ি দিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনার নেত্রে দেখিতেছিলেন কে এক অচেনা কাণ্ডারী তরণী বাহিয়া আসিয়া পড়িল, আর তাঁহারই সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া গেল তাঁহার মন জীবনের আর সকল চাওয়া, সকল পাওয়াকে পশ্চাতে রাখিয়া, তখন কি অন্তরে তাঁহার নীল যমুনার বৈষ্ণব কাণ্ডারীটি উঁকি দেয় নাই ?

"লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হ'তে আনো
কোন্ সুদূরের ধন
ভেসে যেতে চায় মন
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
ওগো কাণ্ডারী, কেগো তুমি, কার
হাসি কান্নার ধন,
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কী মন্ত্র হবে গাওয়া।" (গীতাঞ্জলি)

গীতাঞ্জলির এই অদ্ভুত কাণ্ডারীটিকেই আমরা আবার দেখিয়াছি একদা বরষার এক মেঘমেদুর প্রভাতে সোনার তরণী বাহিয়া কোন্ সুদূর অদৃশ্যলোক হইতে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল, তারপর, কবির পার্থিব অপার্থিব সকল সম্পদ কাড়িয়া লইয়া আবার তরণী ভাসাইয়া চলিয়া গেল। শ্রীরাধা কৃষ্ণকে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহার বহু দুঃখের বহু বেদনার কারণ দস্যু কাণ্ডারীটি তাঁহার হৃদয়কে লুণ্ঠন করিয়া বারে বারে নীল যমুনার পরপারে পাড়ি দিয়াছে, নিষ্ঠুরের মত তাঁহাকে ফেলিয়া গিয়াছে এপারের শূন্য বিরহের বালুচরে। তথাপি ইঁহার এম্‌নি আকর্ষণ যে দর্শনমাত্রেই ইঁহারই তরণীতে সর্বস্ব তুলিয়া দিতে হয়। বৈষ্ণব কবিতার হর্ষবিষাদ-মিশ্রিত বিরহ মিলনের আবেগভরা সুরটি সোনার তরী কবিতায় একেবারে সুস্পষ্ট। এখানে কবির জীবন-দেবতা আসিয়াছেন অদ্ভুত দস্যু-কাণ্ডারী রূপে, কবির জীবনের পার্থিব অপার্থিব সকল সম্পদ, (সোনার ধান) যাহা লইয়া এতকাল

তিনি ভুলিয়াছিলেন সমস্তই কাড়িয়া লইয়া আবার তরণী ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। পিছনে বিরহের শূন্য বালুচরে তিনি পড়িয়া রহিলেন।

শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী

(সোনার তরী)

রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কাব্য বৈষ্ণব পদসাহিত্যের তত্ত্ব ও রূপক উভয়কে অবলম্বন করিয়াছিল এই সত্যটি সরল চিত্তে স্বীকার করিলে সোনার তরী কাব্য গ্রন্থের এই কবিতাটিকে লইয়া সমালোচকদের মধ্যে দ্বিমতের উদ্ভব হইত না। বস্তুতঃ কবির এই যুগের কবিতা ও গানগুলিতে এমন দৃষ্টান্ত বিরল যাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের বহু ব্যবহৃত বিশিষ্ট রূপক চিত্রগুলি পাওয়া যাইবে না। সোনার তরীর কাণ্ডারী সোনার ধান লইয়া গেল কিন্তু চাষীটিকে তাহার তরণীতে তুলিয়া লইয়া গেল না—এই কল্পনার মধ্যে বৈষ্ণব দর্শনের একটি গূঢ়তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মনে হয়। বৈষ্ণব সাধক মুমুক্ষু নহেন, ঈশ্বর সাযুজ্যের কল্পনাও তাঁহাদের মতে পরিত্যজ্য। তাঁহারা চাহেন সামীপ্য; তাই বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধা নিত্য বিরহিণী। যমুনার পরপারে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা, রাধাকে ফেলিয়া তিনি সেইখানে রহিলেন, আর এই পারে রাধা তাঁহার বিরহের আগুনে হৃদয় জ্বালাইয়া (কৃষ্ণগতপ্রাণ হইয়া) মরিয়া বাঁচিয়া রহিলেন।

পৃথিবীতে ঈশ্বর-ভক্তিবিষয়ক কবিতার অভাব নাই কিন্তু অন্য যে কোন ঈশ্বর-বিষয়ক কবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের পার্থক্য এই যে বৈষ্ণব কবিরা কান্তাপ্রেম বা বৈষ্ণব শাস্ত্রোল্লিখিত মাধুর্য ভাবকেই ভগবদ্‌ভক্তির চরম উৎকর্ষ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই অনিবার্য কারণে তাহাদের ভাগবতলীলাবিষয়ক কবিতার বহিরঙ্গ মানবীয় প্রেম লীলার প্রকাশ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

গোড়াতেই অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক কাব্য বলিয়া না জানিলে এই পদগুলি অতি সহজেই মানবীয় কান্তাপ্রেমবিষয়ক কবিতা বলিয়া অনুভূত হইতে পারিত। অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম অনুভূতিকে বৈষ্ণব কবিরা সকাম অনুরাগের ভাষায় ও বর্ণচ্ছটায় রাঙাইয়া দিয়াছেন।

একদা বৃন্দাবনের বনবীথিকায় যাঁহার নূপুর চকিতে বাজিয়া উঠিয়া শ্রীমতীদের উন্মনা করিয়া তুলিত, বহুকাল পরে "শিউলিতলার পাশে পাশে, ঝরাফুলের রাশে রাশে অরুণ রাঙা চরণ" ফেলিয়া তিনিই আবির্ভূত হইলেন।

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।

* * *

তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ।
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে—
নয়ন ভুলানো এলে।

* * *

কোথায় সোনার নূপুর বাজে
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন—ভুলানো এলে।"

(গীতাঞ্জলি)

শ্রীরাধা একদা দয়িত কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—হে সখা, আমাকে ফেলিয়া তুমি চলিয়া যাইওনা। তোমার হৃদয় কি পাষাণ? গীতাঞ্জলির কবি ও দয়িতকে সম্বোধন করিয়া এই মিনতিই জানাইয়াছিলেন।

"হে একা সখা, হে প্রিয়তম
রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে"।

(গীতাঞ্জলি—১৮)

একদা মধুর বৃন্দাবন বিপিনে কুঞ্জ রচনা করিয়া শ্রীমতী তাঁহার দয়িতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল, নির্জন বনবীথিকায় প্রাণসখার সোনার নূপুর তখনো বাজিয়া উঠিল না! সেই নির্জন কাননভূমির নীরব নিশীথে অকস্মাৎ যখন সেই নূপুর বাজিয়া উঠিল তখন কি শ্রীমতীর অন্তরে অবিকল এই প্রার্থনাই গুমরিয়া উঠে নাই!

"কুজনহীন কাননভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিক-হীন পথের পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সুমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়োনা মোরে হেলায় ঠেলে।"

'বেলি অবসান কালে' শ্রীমতী ভরা কলস শূন্য করিয়া ছুটিতেন যমুনা পুলিনে; সেখানে দয়িতের রাঙাচরণের নূপুর, হাতের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমতীর ঘরে থাকিবার উপায় নাই। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের শত শত বার চিত্রিত এই ছবি গীতাঞ্জলিতে নূতন করিয়া চিত্রিত হইয়াছে।

কী ঘুম তোর পেয়েছিল হতভাগিনী।
এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী”

(গীতাঞ্জলি—৬১)

জীবনদেবতার আবির্ভাবক্ষণটিতে নয়ন তাঁহার ঘুমে মুদিয়া আসিয়াছিল, তাই তাঁহাকে পাইয়াও পাওয়া হইল না, শ্রীরাধার এই আক্ষেপকে স্মরণ করাইয়া দেয় গীতাঞ্জলির গান

‘কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়
কেন গো তোর মালার পরশ
বুকে লাগেনি।’

ভক্তকে দেবতার কান্তারূপে কল্পনা করিয়া বৈষ্ণব কবিরা যে মিলন বিরহের অমর গীতি লিখিয়াছেন এই সঙ্গীত সেই কান্তাভাব-স্বরূপ গাঢ় রতিকেই লক্ষ্য করিয়াছে। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের মত বৈষ্ণব ধর্ম দেবতাকে পিতার ন্যায়, প্রভুর ন্যায় ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই। একেবারে বন্ধুজ্ঞানে, সমপ্রাণ সখা জ্ঞানে আপনার আত্মীয় করিয়া লইয়াছে।

“ব্রজ লোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি না মানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে কান্ধে ॥”

গীতাঞ্জলির কবি বলিতেছেন

“দেবতা বলে দূরে রই দাঁড়ায়ে
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে
বন্ধু বলে দু'হাত ধরিনে।

আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে হেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধ'রে
সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে।"

(গীতাঞ্জলি—৯২)

বৈষ্ণব সাহিত্যের শিশু গোপাল চিত্র অবিস্মরণীয়, পবিত্র সৌন্দর্যের স্বর্গীয় মাধুর্যের প্রতিচ্ছবি বলিয়া মানব শিশু চিরকাল শিল্পী ও কবির মন হরণ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের গোপাল বাঙ্গালীর হৃদয়কে চিরকাল আকুল করিয়াছে।

"নাচত মোহন নন্দহুলাল
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন বাজত
কিঙ্কিনী তাঁহি রসাল"

* * *

"অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন ভূষণ
কটিতে কিঙ্কিনী ধটি পীত বসন

* * *

চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে।"

রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে এই শিশুটিই এই বেশে তার ভুবন-মোহন রূপ লইয়া খেলা করিয়াছে।

"তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া,
কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া,
বিহান বেলা আঙিনা তলে এসেছ তুমি কী খেলা ছলে
চরণ হুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া॥
কিসের সুখে সহাসমুখে নাচিছ বাছনি,
হুয়ার পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনি।
তাথেই-থেই-তালির সাথে কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল বেশে ধরেছ হেসে বেণুর পাচনি॥

নিখিল শোনে আকুল মনে নূপুর বাজনা,
তপন শশী হেরিছে বসি তোমার সাজনা,
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে.
জাগিলে পরে প্রভাত করে নয়ন মাজনা।”

(শিশু—খেলা)

এই প্রসঙ্গে আমরা ‘ভানুসিংহের পদাবলী’ কাব্যের আলোচনা করি নাই, যদিও অতি সহজেই পদাবলী সাহিত্যের বিকশিত যৌবন গোপজনবধূদের কিংবা পুলকিত যমুনার পুলিন-বিপিনকে অতি সহজেই ঐ কাব্যে আবিষ্কার করা যাইত। ইহার কারণ ভানুসিংহের পদাবলী আগাগোড়া অনুকৃতি মাত্র, কবির আত্মগত কোন অনুভব এই কাব্যে ধরা পড়ে নাই। আমরা রবীন্দ্র মানসের সন্ধান লইতে বসিয়াছি, তাঁহার রচনা চাতুর্যের নহে।

এই প্রবন্ধে আমরা এইটুকু দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে এককালে যে বিশ্বদেবতার বা অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তার রসঘন অনুভূতি কবিকে ‘সোঽহম্’ ভাবে উন্মুখ করিয়াছিল, তাঁহার এই যুগের কাব্যে সেই বিশ্বদেবতা বৈষ্ণব সাহিত্যে চিত্রিত প্রভু, পরম দয়িত, হাসিকান্নার সুহৃদসখা, মনচোর দস্যু, জীবনযমুনার কাণ্ডারীরূপে দেখা দিয়াছেন। মানে-মিলনে, অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনে, সরমে-ছলনায়, বিরহে-ব্যথায়, ভক্ত ও ভগবান উভয়ে মিলিয়া এই সকল কাব্যে নববৃন্দাবন সৃষ্টি করিয়াছেন।

“প্রাণ চায় চক্ষু না চায়
মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা।
সুন্দর এসে ফিরে যায়
তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা॥
মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ
দহে অন্তরে নির্বাক বহ্নি
ওষ্ঠে কি নিষ্ঠুর হাস
তব মর্মে যে ক্রন্দন, তন্বি,

মাল্য যে দংশিছে হায়
তোর শয্যা যে কণ্টক-শয্যা
মিলন-সমুদ্র-বেলায়
চির-বিচ্ছেদ জর্জর মজ্জা॥"

(প্রবাহিণী)

রবীন্দ্রনাথ এই বৈষ্ণব ভক্তির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিতেছেন—"আমাদের দেশের ভক্তি শাস্ত্রের এই শ্রদ্ধার কথা, অর্থাৎ অনন্তের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে এই কথা, আজকাল অন্যদেশের অন্য ভাষাতেও আভাস দিচ্ছে। সেদিন একজন ইংরেজ ভক্ত কবির কবিতায় এই কথাই দেখলুম—তিনি ভগবানকে ডেকে বলছেন—

Thou hast need of thy meanest creature
Thou hast need of what once was thine :
The thirst that consumes my spirit
Is the thirst of thy heart for mine.

* * * *

আমার জন্যে তাঁরাই যে তৃষা, তাঁই তার জন্যে আমার তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।............সে কবি বলরাম দাসের ভাষাই বল্‌ছে—"তোমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির"—তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে—সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে এসো, সমস্ত দুঃখের পথটা মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে এসো—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সম্পূর্ণ হোক !......আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি, কেন যে তা জানিনা, কিন্তু হে ঈশ্বর তুমি যেমন তেমনিই আছ ; এই যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগ যুগান্তের মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা এই হচ্ছে তোমার অসীম হৃদয়ের এক একটি হৃৎস্পন্দন

অনন্তের মধ্যে এই যে বিরহ বেদনা সমস্ত বিশ্ব কাব্যকে রচনা ক'রে তুলছে—কবি জ্ঞানদাস তাঁর ভগবানকে বলছেন এই বেদনা

তোমাতে আমাতে ভাগ করে ভোগ করব—এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার ; তাই কবি বল্‌ছেন, আমি যে দুঃখ পাচ্ছি তাতে তুমি লজ্জা কোরোনা, প্রভু !

প্রেমের পত্নী তোমার আমি,
আমার কাজে লাজ কি স্বামি !
তোমার সকল ব্যথার ব্যথী আমায়
কোরো নিশিদিন !
নিদ্রা নাহি চক্ষে তব,
আমিই কেন ঘুমিয়ে রবে !
বিশ্ব তোমার বিরাট গেহ
আমিও বিশ্বে লীন।”

(শান্তিনিকেতন)

‘গীতাঞ্জলির’ বহু কবিতাতেই এই ভাবটি রহিয়াছে।

“কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়

*　　*　　*

পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি
তেমনি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে—”

(গীতাঞ্জলি-৬৫)

অনাদি কালের ভাবের উৎস হইতে এই বিশ্ব উৎসারিত হইয়াছে, সৃষ্টি স্রষ্টার বুকের ভাব ধারা। বার বার তাঁহারই বক্ষে ইহা ফিরিয়া গিয়াছে, যাইবে। তাই মানুষের বুকে অনন্তের তৃষ্ণার অবধি নাই। গীতাঞ্জলি-কাব্য কবির বুকের এই তৃষ্ণার আলেখ্য।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

কবি বিশাখদত্ত প্রণীত সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষস ব্যতীত পৃথিবীতে এমন নাটক, উপন্যাস অথবা কাব্য বোধ করি রচিত হয় নাই যে নাটক বা কাব্যে বা উপকথায় নারী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বিরাজিত নহেন। মাতারূপে, কন্যারূপে, বধূরূপে প্রিয়ারূপে নরনারীর জীবন একসূত্রে গাথা হয় বলিয়া একজনকে বাদ দিয়া অন্যের জীবনালেখ্য রচনা যে সম্পুর্ণ হয়না তাহা বলাই বাহুল্য ; তাই যে কাব্য নাটক বা উপকথা ঐহিক জীবনের লীলা চঞ্চলতার উৎক্ষিপ্ত রসনির্য্যাস, স্বাভাবিক কারণেই নারীর প্রবেশ সেই সকল সাহিত্যে অবধারিত। আবার সাহিত্যে সকল শ্রেণীর নারীর মধ্যে প্রিয়া যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে অন্য কেহ ততখানি অসামান্যতা লাভ করে নাই। কেবল ঐহিক জীবনের চিত্রে নহে, আমাদের দেশের ধর্ম্ম সাহিত্যেও এই 'প্রিয়া' যে কত বড় স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই তাহা জানেন। নর ও নারীর প্রিয়-প্রিয়া সম্বন্ধ কামের সম্বন্ধ, কিন্তু কামনার সিন্ধু মথিত করিয়াই যে কাব্য নাটকের রসোৎপত্তি।

এইখানে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই। একমাত্র বৈষ্ণব সাহিত্যে ও ধর্মে কামনারকে নিলোচ্ছাসের মধ্যে কামাতীতের রসনিষ্পত্তির কথাটি মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু গৌড়িয় বৈষ্ণব-ধর্মের এই জীবনদর্শন ভারতীয় বেদান্ত দর্শন হইতে একেবারে পৃথক নহে। বরং উপনিষদের বহু প্রসঙ্গ এই একটি সত্যকে বুঝাইয়া দিয়াছে সে নর-নারীর সঙ্গলিপ্সার মধ্যে ও আত্মা আপন স্বরূপকেই অনুভব করিতে চাহিতেছে, কারণ এই সঙ্গলিপ্সার লক্ষ্য আনন্দ ; অল্পে সুখ নাই, সীমাহারা সুখের জন্য চিত্তবৃত্তি যখন

প্রধাবিত হইবে তখন এই সঙ্গ কামনা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আত্মাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে। খৃষ্টান ধর্ম জগৎকে কাম-বিমুখতা শিক্ষা দিয়াছে। যিশু মানব সন্তান এই কথা খৃষ্টান জগৎ কখনই স্বীকার করিবেনা। কিন্তু অবতার বাদী ভারতবর্ষ বসুদেবের বা দশরথের পিতৃত্ব স্বীকার করিতে কখনও লজ্জা পায় নাই। বেদ বেদান্তের স্রষ্টা বলিয়া আখ্যাত মুণি ঋষিরা কেহই যে নর-নারীর যুগল প্রীতিকে ধিক্কার করেন নাই তাঁহাদের জীবন ও বাণী উভয়ই তাহার প্রমান। কামের মধ্যে কামাতীতের অনুসন্ধান আমাদের নিকট গভীর রহস্যের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ আমাদের বর্ত্তমানের সামাজিক জীবন বহুকাল হইতে বেদান্তের জীবন-দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গ আমরা অধিক দূর টানিয়া লইয়া যাইব না, উপনিষৎ যে ঈশ্বর ব্যতীত চরাচরে দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করে নাই, কেবল সেই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিব।

শাস্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন নাই, মানুষ আপনার অন্তরের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিবেন কামের দুইটি দিক রহিয়াছে—একটি একেবারে স্থুল এবং সেই জন্যই সীমাবদ্ধ; অপরটি স্থুলের ঊর্দ্ধে। কাম যখন স্থুলের ঊর্দ্ধে উন্নতি হয় তখনই তাহা প্রেম নামে আখ্যাত হয়। তখন কাম ভোগকে অতিক্রম করিয়া ত্যাগেই আপন মহিমা প্রতিষ্ঠিত করে। বেহুলা-রূপিনী প্রিয়া তখন অকূল সমুদ্রে ভেলা ভাসাইয়া দেয়। যে কাম মানুষকে জৈব সুখান্বেষণে নিয়োজিত করে তাহাই যে আবার ভোগের সীমাকে 'এহ বাহ্য' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া সীমাহীন ত্যাগের দ্বারা চরিতার্থতা লাভ করে জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্য সেই কাহিনীই বহিয়া বেড়াইতেছে। অন্তত ভারতীয় চিন্তাধারার তাৎপর্য্য এই যে ব্যবহারের দোষে যাহা হলা হল, তাহাই 'ব্যবহারেরগুণে আবার অমৃত। রবীন্দ্র-নাথের প্রায় প্রত্যেকটি প্রেমের কবিতা এই দার্শনিকতায় পরিশোধিত। বিশেষ করিয়া তাঁহার উর্বশী কবিতাটির কথা উল্লেখ

করা যাইতে পারে। উর্বশী পুরাণ আখ্যায়িকার অনিন্দ্যরূপসী বারাঙ্গনা। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের কল্পনাই এই উর্বশী মাতা নহে, কন্যা নহে, বধূ নহে।

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দন বাসিনীউর্বশী।"

তবে তিনি কি ?

"যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভানা উর্বশী।"

ইনি মাতা নহেন, অর্থাৎ কোন সন্তান সৃষ্টি করেন নাই, কন্যা নহেন, অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে সৃষ্টি করে নাই। অযোনী সম্ভবা এই নারী কাহারও সংসারে বধূরূপে পদার্পণ করিয়া সংসার বাঁধেন নাই। ইনি মানুষের সকল বন্ধনের উর্দ্ধে থাকিয়া সমগ্র বিশ্বকে কেবল যৌবনচাঞ্চল্যে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছেন।

"মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল
তোমারি কটাক্ষ ঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল"।

কামের যে তাৎপর্য্য আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার কোন কাল্পনিক মূর্ত্তি যদি মনে মনে ধ্যান করা যায় তবে সেই মূর্ত্তি এই অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী। প্রশ্ন উঠিতে পারে মাতার মধ্যে বধূর মধ্যে কন্যার মধ্যে কামনা কি নাই ? কবি কামনার প্রতিমাকে মাতৃসত্তা; বধূসত্তা এবং দুহিতার ব্যক্তিত্ত হইতে পৃথক করিয়া কল্পনা করিলেন কেন ? করিলেন, কারণ ইঁহারা আবিমিশ্র কামনার মূর্তি নহেন। মাতার স্বার্থ, কন্যার স্বার্থ অথবা বধূর স্বার্থ কামনাকে পদে পদে খণ্ডিত করে। বধূকে সংসার ধর্ম রক্ষা করিতে তুলসীমঞ্চে দীপ শিখা জ্বালিতে হয়, মাতাকে সন্তানের স্বার্থে কামনার দাবীকে সংযত করিতে হয়, কন্যাকে পিতার ও সমাজের শাসন মানিয়া লইতে হয়। বধূ স্বামীর সহধর্মিনী, কন্যা পিতার পালনীয়া। ইঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম রহিয়াছে, কেহই পরিশুদ্ধ কামনার প্রতিমা নহেন। তাই এই কামনার প্রতিমার বর্ণনা দিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

"গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্তদেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোন গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যা দীপখানি।"

বধূর রহিয়াছে সম্ভ্রমবোধ, দ্বিধা, ভয়, কিন্তু উর্বশীর সমাজ নাই, সংসার নাই, তাই দ্বিধা জড়িমাও নাই

"দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর সজ্জাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।"

অর্থাৎ উর্বশী কামনার অকুণ্ঠ, অসম্বৃত অবিমিশ্র ও নিরাবরণ প্রকাশ। হৃদয়-পদ্মে ইহারই চঞ্চল চরণ-স্পর্শ ধ্যানস্থির মুণিকে বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছে।

"মুণিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল"

শুধু কি তাহাই ?

"ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল
শস্য-শীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল ;
তব স্তন-হার হতে নভস্থলে খসি পড়ে তারা
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা ;
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে।"

কবির এই উচ্ছ্বসিত বর্ণনা কেবল শিল্পচাতুর্য্য নহে, ইহার অন্তরালে বিশ্বসৃষ্টির মূল রহস্যটিই গোপন রহিয়াছে। এই কবিতায় শব্দে শব্দে ধ্বনি ও বর্ণ সুষমার যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে পাঠক তাহাদের প্রভাব হইতে ক্ষণিকের জন্য নিজেকে মুক্ত করিয়া যদি চিন্তা করিতে বসেন, তাহা হইলে অনায়াসে তত্ত্বটির মূলে পৌছিতে পারিবেন। তত্ত্বের কথা শুনিতেই কাব্যামোদী হাল্‌কা হৃদয় ব্যথিত হয় জানি, কিন্তু যে কবি সর্বাংশে দার্শনিক, তত্ত্বান্বেষী, তত্ত্বের সন্ধান না লইয়া তাঁহার কাব্যের রসগ্রহণ সম্পূর্ণ হইতে পারেনা। অপব্যাখ্যার আশঙ্কা ত রহিয়াছেই।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিক বলিলেন বিশ্বসৃষ্টির রূপ, রস, শব্দ, গন্ধের তরঙ্গ নিক্ষেপ অচিৎ পদার্থের রাসায়ণিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ফল। কিন্তু অদ্বৈতবাদী দার্শনিক বলেন পরাৎপর চিন্ময় ব্রহ্মাত্মাই অজ্ঞাত কারণে স্বীয় সত্তা হইতে কামনার উদ্ভব করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতিরূপে সৃষ্টির এই লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়াছেন। স্রষ্টার কামনা হইতেই সৃষ্টি। যতদিন এই সৃষ্টি উজানের পথে পাড়ি দিয়া স্বরূপ ব্রহ্মসত্তায় বিলীন না হইতেছে ততদিন এই কামনার লীলা-তরঙ্গ অবিরাম উদ্বেলিত হইবে। আকাশের নীহারিকায় নীল সমুদ্রের তরঙ্গ নিক্ষেপে, ধরিত্রীর শ্যামল অঞ্চলে, জীব-জগতের শিরায় শিরায়, আজও সৃষ্টি-কামনার জোয়ার স্রোত আপনার উদ্দামতায় ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।

"ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে
তরঙ্গের দল
শস্য-শীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার
অঞ্চল।"

ব্রহ্মের প্রকাশ-মহিমাই কামনা। এই তত্ত্বের উদগাতা বলিয়াই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি কামনাকে হেয় করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন "আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়োর্ভবতি।" মনুষ্যচিত্ত স্বভাবতঃ আত্মাকে অনুসন্ধান করে এবং এই আত্মাকে সুখী করিবার জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হয়। দেহজ আকর্ষণকে অতিক্রম করিতে না পারিয়াই মুণিগণ কামনার তাড়নায় ধ্যানভ্রষ্ট হন কিন্তু কামনা যখন দেহের পরিবর্তে আত্মাকে লোভ করিতে থাকে তখন সেই আত্মলিপ্সা পূর্ণানন্দের সাক্ষাৎ করাইয়া দেয়। এই তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই কবি বলিয়াছেন—

"আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।
ডান হাতে সুধা-পাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে॥"

কামই মায়া, মহামায়া। এই মহামায়ারূপিনী দেবী-প্রতিমার এক হাতে সুধা-পাত্র, কারণ ইনিই চিন্ময় আত্মাতে আমাকে

প্রলুব্ধ করিতেছেন, আবার ইনিই স্থূলতার সীমানায় আমার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিবার জন্য অবিদ্যার মায়াজাল পাতিয়া রাখিয়াছেন। বিশ্বস্রষ্টার জ্যোতির্ময় পথ যে এই ভাবে আকীর্ণ রহিয়াছে।

"জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছে তোমার
অতি লঘুভার।"

ধ্যানভ্রষ্ট ঋষি কাঁদিয়াছেন লক্ষ্যচ্যুত হইয়া, আত্মকামী অশ্রুপাত করিয়াছেন, তাঁহার মর্ম সম্পূর্ণ জানিতে পারিলনা বলিয়া; রূপ-সমুদ্র মন্থিত হইয়া অরূপ-অমৃত উৎসারিত হইলনা বলিয়া।

কামনার এই সুমহান্ কল্পনা আজ জগৎ হইতে চির নির্ব্বাসিত হইয়াছে। কামনার বিষোদ্গার পৃথিবীতে কিছু অপ্রতুল নহে, কবি যে এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তাহা শিশুর বুদ্ধিতেও ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তথাপি কবি কেন লিখিলেন—

"আদি যুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবেনা আর
অতল অকূল হতে সিক্ত কেশে উঠিবে আবার?"
"ফিরিবেনা, ফিরিবেনা, অস্ত গেছে সে গৌরব শশী
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চির বিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূর স্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল করা বাঁশি
ঝরে অশ্রুরাশি
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে,
অয়ি অবন্ধনে।"

যে কামনা মৃত্যু ও অমৃত দুয়েরই সন্ধান দিতে পারে সেই কামনার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আদিযুগ পুরাণেই হইয়াছিল। অন্ততঃ

কবির তাহাই বিশ্বাস। বর্ত্তমান যুগ নানা ভ্রান্ত মতের ঘূর্ণাবর্ত্তে ইহার অবলুপ্তিই ঘটাইয়াছে। এখন আমরা পৃথিবীতে কেবল তাহারই সন্ধান পাই যে 'প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে।' আজ তাঁহার বামকরের বিষভাণ্ডটাই আমাদের জন্য রহিয়া গিয়াছে, দক্ষিণ করের সুধার পাত্রটি জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ কাড়িয়া লইয়া কোন অজ্ঞাত সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন কে জানে? কোথায় মহামায়ার সেই চিন্ময়ী প্রতিমা? হৃদয়-সমুদ্র হইতে সমুত্থিত হইয়া হৃদিদলে তিনি বিরাজ করিতেছেন কোথায়? যে সুমহান কামনা চিন্ময় আত্মার পানে প্রধাবিত হয় তাহা নিশ্চয় পার্থিব মাতৃত্ব বা বধূধর্মকে আশ্রয় করেনা. তাই উর্বশী, 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী'।

উর্বশী কবিতাটির আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। কারণ আজ পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এই কবিতাটির সম্পূর্ণ রহস্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করেন নাই। যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা ইহার শেষ দুই স্তবকের কোন অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া কবিতাটি কবির অক্ষম সৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই। সেই গৌরব শশীর মহিমা যিনি জানেন না তিনি যে অর্থকে কদর্থে পরিণত করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

'উর্বশী' কবিতাটি চিত্রা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কাব্যগ্রন্থের 'বিজয়িনী' কবিতাটিতে কবি তাঁহার তত্ত্বটি স্পষ্টতর করিয়া বলিয়াছেন। এই কবিতাটির আখ্যানভাগের মর্মার্থ এই যে অচ্ছোদ সরসীনীরে এক অপূর্ব রমণী যখন স্নানান্তে ঘাটের সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিতেছিলেন তখন তাঁহার সদ্যস্নাত তনুর তনিমা নিরীক্ষণ করিয়া সমগ্র জগৎ যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

"ঘিরি তার চারি পাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তার"

ঠিক এই সময়ে আচম্বিতে অনঙ্গদেব আবিভূ'ত হইয়া রমণীকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ফুলধনুতে পঞ্চশর যোজনা করিলেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ধনুঃশর তাঁহার হস্তেই ধৃত রহিল। তিনি

"পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময় ভরে,
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশর ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিল সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।"

মদনের পঞ্চশর দেহজ কামের রূপক চিত্র। এই পঞ্চশর যাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলনা সেই রমণী কে? উপনিষদে আছে,—নারী দুই জাতীয়া, এক শ্রেণীর নারী সদ্য বধূ, অন্যা চ ব্রহ্মবাদিনী। অচ্ছোদ সরসী নীর হইতে "যে রমণী সদ্য উঠিয়া আসিয়াছেন তিনি কবির ব্রহ্মবাদিনী নারীর কল্পনা প্রতিমা। এই নারীকেই কবি বন্দনা করিয়াছেন চিরকাল। নারীত্বের মধ্যে যাহা স্থূল, যাহা পুরুষের দেহজ কামনাকে উৎসিক্ত করে রবীন্দ্রকাব্যে তাহার স্থান বিরল। 'উর্বশী' তাঁহার বামকরধৃত বিষভাণ্ডটিই কেবল যে নারীর অন্তর্লোকে ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহার দক্ষিণ করের দাক্ষিণ্য হইতে যিনি চির বঞ্চিত, সেই নারী তাঁহার কৈশোরের লেখা কয়েকটি কাব্য-গ্রন্থের পরে একেবারে নির্বাসিতা হইয়াছেন। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের পর হইতে তাঁহার আজীবনের রচনার বেশীর ভাগই জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতার লীলা চঞ্চলতাকে এবং এই দুইএর অনুভূতির সংঘাতকে কেন্দ্র করিয়া। তাই বহুকাল কবির লেখাচিত্রে আমাদের ঘরের সাধারণ রমণী ফুটিয়া উঠে নাই। পরিণত বয়সে 'মহুয়া' কাব্যে তিনি এই চেষ্টা একবার করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইখানেও নারী একেবারে সাধারণের স্তরে নামিয়া আসিতে পারে নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের নারী সাধারণ হইয়াও অসাধারণ। মহুয়ার নারীকে তাহার দয়িত বলিতেছেন—

"আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা
গড়িবনা ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে
পঞ্চশরের বেদনা মাধুরী দিয়ে
বাসর শয্যা রচিবনা মোরা প্রিয়ে।"

নারীত্বের এই আদর্শেরই অভিনব প্রকাশকে শেষের কবিতা নামক উপন্যাসটির 'অমিত ও লাবণ্য' নামক চরিত্র যুগল তাহাদের জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে লীলয়িত করিয়াছে। দেহজ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া যে প্রেম অন্তরে আনিয়াছে অপার্থিবের বাণী, লাবন্যের মন তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া দয়িত অমিতের দেহ সীমার বাহিরে চলিয়া গেল এবং অমিতর জন্য ও সেই অবিস্মরণীয় মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমই রাখিয়া গেল। অমিতর অন্তর্বাসী কবি সত্তা।—(রহস্যচ্ছলে কবি যাহার নাম দিয়াছেন নিবারণ চক্রবর্ত্তী) লাবণ্যের মাটির দেহের মধ্যে অমৃত মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, ফুলধনুর পঞ্চশর যে মূর্তির নিকট মাথা নত করিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। তাই লাবণ্য বলিতেছে—

"সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তনের অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।"
মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মূরতি
যদি সৃষ্টি করে থাকে—তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা—
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবেনা মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে"।

এই নারীত্বের আরও ভাস্বর মূর্ত্তি 'তপতী' নাটকের সুমিত্রা। ব্রহ্মবাদিনী এই নারী স্বামী বিক্রমের দেহজ কামনার অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে অস্বীকার করিয়া হোমাগ্নিতে মাটির দেহ ভস্ম করিয়াছিল।

"রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে। আজ আমার সেই অনেকদিনের সঙ্কল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরম তেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব" (তপতী)

বিশ্বপ্রাণ তপনের রুদ্রতেজে পরিশুদ্ধা এই নারী সংসারে দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু কবির মানস-লোকে ইহারই লঘুচরণভাব ভাবরসের যে স্পন্দন তুলিয়াছে, তাঁহার কাব্যে, কথায় তাহাই তরঙ্গায়িত হইয়াছে। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কোন রচনাতেই আপনার কবি-ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তখন তিনি নিজের কাছে নিজেই রহস্যময়! অতএব তাঁহার 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' 'প্রভাত সঙ্গীত' 'কড়ি ও কোমল' ইত্যাদি কাব্যে নারীত্ব বা নারীপ্রেমকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কবিতা রচিয়াছে সেইগুলি রবীন্দ্র মানসের কোন পরিচয়ই বহন করেনা। বরং ইহাদের মধ্যে যে কামনার অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে কবির পরিণত বয়সের রচনায় সেই অনুভূতি ও আদর্শ ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে।

মানসীতেই প্রথম কবি বলিতেছেন—

"অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য শিখা।

(মানসী-নিষ্ফল কামনা)

"নিষ্ফল কামনা" কবিতাটি নিষ্ফলতার খেদোক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু নৈরাশ্যের মধ্যে ও একটি আশার সুর এই কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই আশার উৎস এক অভিনব আদর্শের উপলব্ধির মধ্যে। যে নারী এতকাল ছিল কেবল কামনার ইন্ধন

সেই নারীর আর একটা অজ্ঞাত দিক হঠাৎ কবির চোখের দুয়ারে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন যে তাহাকে পাইয়াও সম্পূর্ণ করিয়া এতকাল পাওয়া হয় নাই সেই রহস্যটিই দিবালোকের মত স্পষ্ট হইল। নারীর দেহের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছে তাহার আত্মার অনির্বাণ আলো এবং সেইখানে সে সামান্যা নহে সে অসীম। তাহার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব রহস্যের এক নিবিড় নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, সেইখান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে পাওয়ার চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য।

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব
কেহ নহে তোমার আমার
অতি সযতনে
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখ নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে
জীবনে মরণে
শত ঋতু আবর্তনে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—
সুতীক্ষ্ণ বাসনা—ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?

মানব (এইখানে নারী) কাহার ও ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন নহে। যে নিয়মে বিশ্বে শত সৌন্দর্য্যের শত মাধুর্যের শত দল নিত্য প্রস্ফুটিত হইতেছে সেই এক বিশ্বনিয়মেই নারীর দেহকে ঘিরিয়া সুন্দর বিভাসিত হইতেছে, অর্থাৎ বিশ্ব যে চিরসুন্দরের প্রকাশ, নারীর দেহের অন্তরালে থাকিয়া সেই সত্য শিব সুন্দরই আপনার অতি সুশোভন অস্তিত্বের বাণী রূপে রেখায় ফুটাইয়া তুলিতেছেন। তাই এই সৌন্দর্য, এই রূপকে ঘিরিয়া তাহারই দ্যোতিনা হইতেছে যাহা অপরূপ, অরূপ। অতএব কাহারও সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের তাগিদ হইতে বিধাতা নারীর সৃজন করেন নাই। এইরূপ সঙ্কীর্ণ

সঙ্কীর্ণ কামনার অনুভব লইয়া তাহার দিকে তাকাইলে তাহাকে সম্পূর্ণ দেখা হইবে না। তাই কবি শেষে বলিতেছেন—

"ভালোবাসা, প্রেম হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে।
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।"

একটি মানবীর দেহের সংসর্গকে উপেক্ষা করিয়া কবির চিত্ত যে এখন হইতেই এক বিশ্বমানবীকে খুঁজিতেছে তাহার আভাস কবি মানসী কাব্যেব 'পুরুষের উক্তি' কবিতাটির মধ্যে দিয়াছেন—

"কখনো বা চাঁদের আলোতে
কখনো বসন্ত সমীরণে
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপার রহস্যময়ী
আনন্দ মূরতিখানি জেগে ওঠে মনে।"

(মানসী—পুরুষের উক্তি)

নারীত্বের যে একটি সর্বজনীন মূরতি আছে যেখানে সে অসীমা পৃথিবীর নারীর মধ্যে কবি সেইটিই এখন খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। এই নারী অপার 'রহস্যময়ী', 'ত্রিভুবনজয়ী' এবং 'আনন্দ মূরতি'। এই তিনটির প্রত্যেকটি বিশেষণ লক্ষ্য করিবার মত। যে নারী নৈর্বক্তিক প্রেম ও সৌন্দর্যের ঘনীভূতা প্রতিমা তাহার মধ্যে আনন্দ ছাড়া বিষাদ আসিবে কোথা হইতে? সে ত্রিভুবনজয়ী ত বটেই। এই নারী বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, অতএব বিশ্বরহস্যের যেমন অন্ত নাই, এই নারীও অপার রহস্যময়ী। যে নারী কবির ঐ সুমহান অনুভূতির রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, সংকীর্ণ সাংসারিকতার মোহে আবদ্ধ যাহার মন, 'পুরুষের উক্তি' কবিতাটি সেই নারীর উক্তির প্রত্যুত্তর। মানসীর "নারীর উক্তি" এবং "ব্যক্ত প্রেম" কবিতা দুইটির মধ্যে অতীব সাধারণ মেয়ের বাসনার আর্তিকে ভাষা

দেওয়া হইয়াছে। এই জাতীয় নারীর হতাশার উত্তর দিতে গিয়া কবি যেন কৈফিয়ৎ স্বরূপ "পুরুষের উক্তি"র মধ্যে তাঁহার আদর্শ নারীত্বের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। "মানসী" কাব্যেরই "অনন্ত প্রেম" নামক কবিতাটির মধ্যে কবি বলিতেছেন নারীপ্রেম ক্ষণিকের খেলা-ঘরের সামগ্রী নহে, একটি জীবনের পাথেয়ও নহে, তাঁহার প্রিয়া যুগ যুগান্তের প্রিয়া। অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হইতে দুইটি প্রেমের স্রোত যাত্রা সুরু করিয়াছিল, কোটি জনমের কোটি প্রেমিকের মাঝে খেলা করিয়া অনন্তের দিকে ইহারা চলিয়াছে। সকল কালের সকল কবির গীতি, নিখিল মানবের প্রাণের প্রীতি, প্রেমের স্মৃতি এই দুই স্রোতে মিশিয়া রহিয়াছে। এই উক্তি মুগ্ধ প্রেমিকের অতিশয়োক্তি নহে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে কবির সেই অদ্বৈত উপলব্ধির আভাস যে উপলব্ধিতে নিখিলের খণ্ডরূপ, খণ্ডপ্রীতি অনন্ত অনাদি অসীম সত্য শিব সুন্দরের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। সারা বিশ্বই ত সেই এক অসীমের প্রেমের প্রকাশ।

"আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়ন সলিলে, মিলনমধুর লাজে
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে॥

* * * * *

নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ নিখিল প্রাণের প্রীতি—
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি"

(অনন্ত প্রেম—মানসী)

"সোনার তরী"তে গৃহবনিতার দেহ পূরাপূরি লোপ পাইয়াছে। কবির চোখে তাঁহার প্রিয়ার আত্মার পরিচয়টি ছাড়া আর সব পরিচয়ই মুছিয়া গিয়াছে।

গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছে উদয়

(মানস সুন্দরী—সোনার তরী)

সোনার তরীর "হৃদয় যমুনা" কবিতাটিতে নারীর দেহের আবেদনের কথাটিই মুখ্যভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই কবিতাটিতে শিল্পচাতুর্য আছে কিন্তু ভাবের গভীরতা বা তন্ময়তা নাই, কারণ পার্থিব প্রেম, দেহের কামনা বা আবেদন রবীন্দ্র-মানসকে কোন কালে বিহ্বল ত করেই নাই, বরং তাচ্ছিল্যই লাভ করিয়াছে। যে অনুভূতি কবির আত্মগত নহে তাহা ফুটাইবার চেষ্টা করিলে কৃত্রিমতা আসিতে বাধ্য, মনোহর শব্দের ও চিত্রের ইন্দ্রজালে তাহা একেবারে গোপন থাকিতে পারে না। পার্থিব প্রেমের কবিতার যাঁহারা স্তাবক তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কবিতার উচ্চ প্রশংসা করিতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকুও এই শ্রেণীর কাব্যে নাই এবং সেই কারণেই এইগুলি যেন অন্তঃসারহীন।

এই প্রসঙ্গে 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যের কচ ও দেবযানী চরিত্রের পার্থক্য লক্ষণীয়। দেবযানী কচকে তাহার আশ্রমে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল এবং তাহাতে বিফল হইয়া অভিশাপ দিয়াছিল, আর কচ তাহার উত্তর দিল অতি সঙ্ক্ষিপ্ত দুইটি কথায়—

"আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে॥"

বৃহৎ কল্যাণের ক্ষেত্র হইতে যে নারীপ্রেম পুরুষকে পার্থিব ভোগবাসনার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করিতে চাহে তাহাতে যতই তীব্রতা থাকুক, সত্য বলিতে কিছুই নাই, তাই দেবযানীর পক্ষে ভুলিয়া যাইতেও বিলম্ব হইবে না। পৌরাণিক গল্পের দেবযানী যে কচকে ভুলিয়া গিয়াছিল তাহাও আমরা জানি। এই কাব্যে স্বর্গের দেবতা কচের মধ্যে দেখিতে পাই দেবতাসুলভ প্রশান্তি, আকাশের মত উদাস ঔদার্য ও তিতিক্ষা, পার্থিব নারী দেবযানী বহুদিন ইহার সাহচর্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইহার দেবত্বের কণামাত্রও পায় নাই,

পৃথিবীর কন্যা মাটির বন্ধনকেই বড় করিয়া জানে তাই কচ যে স্বর্গে গিয়াও তাহাকে ভালবাসিতে পারে এই কথার মর্ম সে কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিল না।

"আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়,
সখী। বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব।"

যে বিশুদ্ধ প্রেম কেবল অন্তরের সুধা, অন্তর দিয়া যে নারী তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না তাহাকে কি ভাষায় উহা বুঝান যাইবে। যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে 'সেই প্রেম পথের ধূলায় অচল নিগড় নির্মাণ করিতে চাহিবেই, তাই মোহগ্রস্তা দেবযানীর ব্যাকুলতার অন্ত নাই। সমগ্র বিশ্ব, বিশ্ব-কল্যাণ তাহার কাছে একেবারে গৌণ হইয়া গিয়াছে, তাই ক্রুদ্ধ ফনিনীর মত অভিশাপের বিষোদ্গার করিয়া দেবযানী কচের কল্যাণব্রতকে দগ্ধ করিতে চাহিল।

আর বিশুদ্ধ প্রেমে সমুদ্ভাসিত দেবপুত্র কচ এই অভিশাপের উত্তরে মাটির বুকে তাহার স্বর্গীয় প্রেমের শেষ পরিচয় রাখিয়া গেল একটি কথায়--

আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।"

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ প্রেমের প্রতিষ্ঠা কল্যাণে, ভোগের মধ্যে সেই প্রেমের মৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য প্রেমের কবিতা ও নারী চরিত্র রহিয়াছে, প্রত্যেকটির পরিচয় দিতে গেলে আমার এই পুস্তক কখনো শেষ হইবে না, তাই আর একটি চরিত্রের আলোচনা করিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

একদিকে যেমন কবি প্রিয়ার মধ্যে কল্যাণীকে খুঁজিয়াছেন, অন্যদিকে তাঁহার সৃষ্ট জননীও অনন্যসাধারণ। ভালমন্দ, পাপপুণ্যকে বিসর্জন দিয়া—বৃহত্তর কল্যাণকে বিস্মৃত হইয়া পৃথিবীর মাতা আপন স্বার্থপরতার স্নেহাঞ্চলে পাপী পুত্রকে আড়ালে

আড়ালে রাখিয়া লালন করিতে চাহিবেন ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া আমরা জানি। জননীর অঞ্চল অবগুণ্ঠনের মধ্যে পুত্র, কেবল পুত্র, সে ভাল নহে, মন্দ নহে পাপী নহে, পুণ্যবান নহে······সে সন্তান। মহাভারতের গান্ধারী অন্যদিকে পুণ্যব্রতা বলিয়া কীর্তিত হইলেও দুর্যোধনাদি পাপী সন্তানদের সম্পর্কে কেবল স্নেহাতুরা, পাপী পুত্রের স্বার্থান্বেষিণী গর্ভধারিণী জননী! কুরুক্ষেত্রের শশ্মান ভূমিতে গান্ধারীর উন্মাদিনী মূর্তি, কৃষ্ণকে তাঁহার অভিশাপ অবিস্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে নব পূরাণ সৃষ্টি করিয়াছেন সেইখানে গান্ধারী মহাভারতের গান্ধারীর একেবারে বিপরীত সৃষ্টি। পৌরাণিক উর্বশী মদন বা নটরাজকে যেমন রবীন্দ্রনাথ নব বেশে, অভিনব মহিমায় মণ্ডিত করিয়া নব পূরাণ সৃষ্টি করিয়াছেন, গান্ধারীর ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। গান্ধারীর আবেদন কাব্যের জননী একদিকে দুর্মতি পুত্রের জন্য চোখের জল মুছিতেছেন, অন্যদিকে পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া সেই পুত্রেরই বিসর্জন ভিক্ষা করিতেছেন। এই জননীর মধ্যে যেন কথা কহিয়াছে নিখিল বিশ্বজননী যিনি কোমল হইতেও কোমল, নিষ্ঠুর হইতেও নিষ্ঠুর! পাপী কল্যাণবৈরী সন্তানকে যিনি নিজ হস্তে সংহার করিতে দ্বিধা করেন না, মুখে যাঁর স্বর্গীয় প্রেমের সুকল্যাণ হাসি।

এই অলৌকিক নারীচরিত্রের অন্তর মহিমাকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই ভাষা দিতে পারেন, তাই এই নারীর শেষ কয়টি উক্তি উদ্ধার করিয়া দিলাম,

"······নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি; নমো নমো নম
কলাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নিবৃত্তি—
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।"

(কাহিনী—গান্ধারীর আবেদন)

রবীন্দ্র সাহিত্যে নিসর্গ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের এক যায়গায় লিখিয়াছেন দেহের রূপ কেবল মাত্র রূপ নহে, উহা 'আত্মার রহস্য শিখা।' কৈশোর হইতে বার্দ্ধক্যের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত কবি বর্হিজগতের যত ছবি আঁকিয়াছেন তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে তাঁহার এই উক্তির স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এমন কোন নক্ষত্র তিনি দেখেন নাই যে নক্ষত্র-কিরণ তাঁহাকে বহিরাকাশ হইতে সৃষ্টির অন্তরালস্থিত এক অলক্ষ্য রহস্য-লোকে লইয়া যায় নাই। কবির চোখে বর্হিলোকের অসংখ্য মূরতি যেন এক অলক্ষ্যপুরীর উন্মুক্ত বাতায়ণের প্রদীপমালা, ইহাদের আলোকরেখা ধরিয়া সেই অদৃশ্যপুরীতে পৌঁছিতে পারিলে সৃষ্টির অনন্ত রহস্যকে উপলব্ধি করা যায়। বর্হিপ্রকৃতির অন্তরালস্থিত অনন্ত ভাবসমুদ্র শতধারে, শতবর্ণে, শত রেখায়, শতদলে আমাদের চোখের সম্মুখে চম্‌কাইয়া যাইতেছে, যতই তিনি তাহাদের পানে তাকাইতেছেন, ততই মন তাঁহার ডুবিয়া যাইতেছে অরূপের অতলান্ত সমুদ্রে।

যে সুন্দর ইন্দ্রিয়ের, অর্থাৎ বর্ণের, রেখার ধ্বনির, তাহা আপাতঃ দৃষ্টিতে মৃৎ-ঘন হইলেও কবির অন্তর একমুহূর্ত্তে অনুভব করিয়া লয় তাহারা মৃত্তিকার প্রাণহীন মূরতি নহে, তাহারা চিন্ময়বাণী, অনন্ত অজস্র প্রাণের আলেক-দূতী। অন্তরে তাঁহার ভাব সমুদ্র উথলিয়া উঠে। কবি প্রত্যক্ষ করেন বর্হিবিশ্বে যে উত্তাল সমুদ্র শত আলোরও ধ্বনির লীলাকমল বিচ্ছুরিত করিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহার অজস্রতায় মিশিয়া যাইবার জন্য তাঁহার অন্তর্লোকে আর একটি শ্রোতধারা হৃদয়ের কারা প্রাচীরে আঘাতর পব আঘাত হানিতেছে। তারপর কখন এই দুইএর সীমা রোখা বিলুপ্ত হইয়া

যায়, বর্হিবিশ্বের প্লাবনের সাথে কবির সমগ্র সত্তা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাসিয়া যায়। মাঝে মাঝে এই রহস্যকে ভাষা দিতে গিয়া কবি কখনও বলিয়াছেন আমাকে যে আমি সমগ্র বিশ্বে দেখিলাম, কখনও বলিয়াছেন বিশ্বস্রষ্টার বিপুল জগৎখানা কোন্ অদৃশ্য পথ দিয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে আসিয়া ভিড় করিল।

"তব পথচ্ছায়া বাহি বাঁশরীতে যে বাজালো আজি
মর্ম্মে মোর অশ্রুত রাগিণী
ওগো আম্রবন,
তারি স্পর্শে রহি রহি আমারো হৃদয় উঠে বাজি
চিনি তারে কিম্বা নাহি চিনি
কে জানে কেমন।
অন্তরে অন্তরে তব যে চঞ্চল রসের ব্যাগ্রতা
আপন অন্তরে তাহা বুঝি,
ওগো আম্রবন।
তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমারি মতন চাহে কথা
মঞ্জরীতে মুখরিয়া আনন্দের ঘন গূঢ় ব্যাথা :
অজানারে খুঁজি
আমারি মতন আন্দোলন।"

বনবাণী।

ইহাকে প্রকৃতির পূজা বলিলে ভুল বলা হইবে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির পূজারী নহেন, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অন্তরস্থিত প্রাণের পূজারী।

বর্হিপ্রকৃতির সহস্র মূরতি তিনি আঁকিয়া লইয়াছেন কিন্তু সেগুলি অবিমিশ্র স্বভাবের মূরতি নহে, যেই যেই ক্ষণের মূরতি তিনি আঁকিয়াছেন বর্হিবিশ্ব হইতে তাহাদের ফটো লইয়া কবির আঁকা-ছবির সাথে মিলাইলে 'অনেকক্ষেত্রেই মিলিবেনা, কারণ তাহারা ভাবের মূরতি, কবির অন্তরের রসমূরতি। বর্হিজগৎ তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করে, কিন্তু সেইখানে যাইয়া তাহারা এক নূতন জগৎ সৃষ্টি

করিয়া তুলে, অক্ষরের সীমার মধ্যে কবি সেই নূতন জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্য ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যকে আবার ফুটাইয়া তুলেন। আমরা তাহাই পাই। কবি বুদ্ধির দ্বারা যে একটা রূপান্তর সৃষ্টি করিয়া দেন এমন নহে, বর্হিপ্রকৃতি কবির ধ্যান্ দৃষ্টির সামনে স্বতঃই তাহার গোপন ভাব-মূর্ত্তিকে অনাবৃত করিয়া মেলিয়া ধরে। রূপ রূপাতীত হইয়া, কখনও বা রূপান্তরিত হইয়াই তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করে। কবি বলিয়াছেন, "নটরাজের তাণ্ডবে, তার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরালোকে রূপলোক আবর্তিত হোয়ে প্রকাশ পায়. তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরালের রসলোক উন্মেষিত হতে থাকে অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ডলীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধন মুক্ত হয়।" (নটরাজ ঋতুরঙ্গ শালা) কবির এই কটি কথা কেবল তাঁহার নটরাজ পালাগাণেরই ভূমিকা নয় তাঁহার জীবনের সমগ্র সৃষ্টির ভূমিকা। এই কটি কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পরিলে আমরা কেবল তাঁহার প্রকৃতি-বর্ণনার বা ঋতুপূজার তাৎপর্য্য নয়, রবীন্দ্র-মানসের যথার্থ স্বরূপ, তাঁহার অন্য সকল সৃষ্টির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিব।

বর্হিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কবির ধারণাটি আমারা এইখানে তাঁহার নিজের কথাতেই পাইলাম। নটরাজের এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরালোকে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়। এইখানে রূপলোক বলিতে বুঝিতে হইবে প্রকাশিত জগৎ বা প্রকৃতি—সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় মূর্ত্তি। ইহারা রূপ, কারণ ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নিচয়; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতে ইহাদের দেহ গঠিত। সমগ্র বিশ্বকে যদি একটি অনন্ত সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করি তাহা হইলে ইহারা প্রত্যেকে বিশ্বরূপ অনন্ত সাগরের স্রোতে ভাসমান এক একটি পদ্ম। বিশ্বের এই ক্ষুদ্র বৃহৎ খণ্ড খণ্ড দেহগুলি আপনা হইতে আপনি সৃষ্ট হয় নাই। ইহাদের স্রষ্টা রহিয়াছে। কবির চোখে সেই স্রষ্টা 'নটরাজ'। নটরাজ অলক্ষ্যে থাকিয়া তাণ্ডব নৃত্য

করিতেছেন, আর তাঁহার নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে বহির্বিশ্ব এবং উল্লিখিত মূর্ত্তিগুলি এক একটি পদ্মের ন্যায় বহিরালোকে ভাসিয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকে স্রষ্টার লীলা এবং স্রষ্টাকে 'লীলাময়' বলা হয়। লীলাচ্ছলে স্রষ্টা যেন এই অসংখ্য ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। স্রষ্টাকে নটরাজ কল্পনা করিবার ইহাই তাৎপর্য্য। এই বিশ্ব এবং বিশ্বের বস্তু নিচয় তাঁহার পদক্ষেপে তাঁহার অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। অতএব ইহারা এবং স্রষ্টা নিশ্চয় অভিন্ন। অর্থাৎ এক ঈশ্বর বহু মূর্ত্তিতে বহিরালোকে বিরাজ করিতেছেন। ইহারা দেহী কিন্তু কেবল মাত্রই কি দেহী? কবি এই প্রশ্নেরও উত্তর দিতেছেন—"তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরালের রসলোক উন্মেষিত হতে থাকে। অভিধানে 'রস' শব্দের প্রতিশব্দ নাই। এইখানে রস বলিতে আমরা আপাততঃ প্রাণের লীলা চঞ্চলতাকে ধরিয়া লইব। স্রষ্টা তাঁহার দেহ হইতে যেমন ভৌতিক বস্তু নিয়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি এই দেহগুলিকে অবলম্বন করিয়া যে প্রাণের লীলা চঞ্চলতা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও তাঁহা হইতেই আসিতেছে। অর্থাৎ দেহ ও প্রাণ উভয়ই তিনি। রূপের মধ্যে এই প্রাণই অরূপ। বর্হিবিশ্বের এই প্রাণের লীলা চঞ্চলতাকে ঘিরিয়া এক অপার রহস্যের লীলা চলিতে থাকে। এই চঞ্চলতাই রস বা আনন্দ। "অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধন মুক্ত হয়।" অনন্তকাল ব্যাপিয়া স্রষ্টার উল্লিখিত সৃষ্টি-শ্রোত বহিয়া চলিয়াছে। অনন্তকালের বুকে প্রাণময় এই সৃষ্টি যেন নটরাজের নৃত্যছন্দ। প্রতি দেহকে ঘিরিয়া, অর্থাৎ রূপকে ঘিরিয়া, এই যে অরূপ প্রাণের লীলা চঞ্চলতা প্রকাশ পাইতেছে তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিলে আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি খণ্ড খণ্ড রূপ বা দেহের পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই, তাহারা অনন্ত ব্রহ্মের একাংশ মাত্র। সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ, অগ্নির এক একটি স্ফুলিঙ্গ যেমন আলাদা বস্তু নহে, জগতের এক একটি খণ্ডরূপও পৃথক বস্তু

নহে। সীমাহীন সমুদ্রের আর সীমিত তরঙ্গের পৃথক সত্তা নাই। অগ্নির আর অগ্নির অসংখ্য লেলিহান জিহ্বার পৃথক সত্তা নাই। বিশ্বের নটরাজরূপী স্রষ্টার ও তাঁহার সৃজিত সৃষ্টিরও আলাদা সত্তা নাই। তরঙ্গ সীমিত হইয়াও অনন্ত। অগ্নির এক একটি স্ফুলিঙ্গ ক্ষুদ্র হইয়াও বিরাট। অবিকল সেইরূপ আকাশের প্রতিটি তারা, বৃক্ষের প্রতিটি ফুল, সমুদ্রের তটরেখার প্রতিটি বালুকণা, মানুষ, কীট, পতঙ্গ, সীমাবদ্ধ হইয়াও অশেষ। খণ্ডের মধ্যে এই অখণ্ডকে উপলব্ধি করাই কবির ধর্ম। যে সাধক সৃষ্টির এই তাৎপর্য্য জানেন তাঁহার কাছে খণ্ড অর্থাৎ সীমিত দেহের অস্তিত্বই নাই, আছে কেবল অনন্তের অস্তিত্ব। তিনি জানেন যাহাকে দেহ বলিয়া জানিতেছি, অনন্ত সমুদ্রের রহস্য অনন্ত নৃত্যচ্ছন্দে তাহার মধ্য দিয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি—ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির এই অখণ্ডলীলা রসই পান করিয়াছে।

কবির উল্লিখিত উক্তি হইতে পরিষ্কার পতিপন্ন হইবে কবি প্রকৃতির পানে নয়ন মেলিয়া যখন তাকাইয়াছেন তখন ঠিক প্রকৃতিকে দেখেন নাই। দেখিয়াছেন দেহাতীত পরাৎপরকে, ব্রহ্মকে, সচ্চিদানন্দকে। অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মের সৎস্বরূপকে যিনি জানিয়াছেন তাঁহারই আত্মা রূপের মোহ হইতে, খণ্ডের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সৃষ্টির অখণ্ডলীলারস উপলব্ধি করেন। কবি ও ঋষির মধ্যে প্রকৃত কোন ব্যবধান নাই। তাই বলিতেছিলাম কবির চোখে রূপ রূপ নহে, অনন্ত আত্মার রহস্য শিখা। কবি বিশ্বের রূপের বহিরাবণের অন্তরালস্থিত অরূপের সন্ধানী। রূপ তাঁহার কাছে ভাবময়, বাঙ্‌ময় প্রাণস্বরূপ।

"দেখেছি ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য
আপনারে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপনাতে যার আপনি আছে।
যে নটরাজ নাচের খেলায়—

ভিতরকে তার বাইরে খেলায়
কবির বাণী অবাক মানি
তারি নাচের প্রসাদ যাচে।

(নটরাজ ঋতু রঙ্গশালা)

বনবাণীর ভূমিকায় কবি বলিতেছেন—ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা'হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায়·········কেবল পরম শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এত স্যৈবানন্দস্য মাত্রানি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে ; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।"

"বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসব-মন্ত্রহীন ;
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়—
যে গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীয় প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্ত্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি।

* * * *

তরুশ্রেণী অরূপ প্রাণকে পৃথিবীতে প্রথম রূপ দিয়াছিল। যে দিন তরু ছিল না পৃথিবী ছিল শূন্য মরুময়। সেই অনাদিকালে পৃথিবীতে যে ঋতু পরিবর্ত্তন হইল তাহার কোন চিহ্ন কোথাও ছিল না। পৃথিবীতে তরু জন্মিল, রূপহীন প্রাণ এই তরুর শাখায় শাখায়, পল্লবে পল্লবে, বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র গন্ধে আপনার স্বাক্ষর

লিখিয়া দিল, বায়ু লাভ করিল সঙ্গীত, তরুর শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় আবর্ত্তিত হইয়া। মৃত্তিকার পটে চিরসুন্দরের প্রাণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। যাহার চক্ষু আছে সেই দেখিবে তরুর এই সৌন্দর্য্য প্রাণহীন বর্ণের খেলা নয়, দৃষ্টিভ্রম নয়, দৃশ্য প্রকৃতির অন্তরে যে সত্য শিব সুন্দর রহিয়াছেন, এই বর্ণ মহিমা তাঁহারই অনন্ত দীপ্তির খণ্ডরূপ।

'নটরাজ' পালাগানের এক জায়গায় কবি বলিতেছেন বিশ্ব প্রকৃতিতে যে রূপের নৃত্যচ্ছন্দ চলিয়াছে, তাহা একদিকে যেমন রূপের অন্তরস্থিত অখণ্ড অদ্বৈত প্রাণের সন্ধান দিয়া আমাদিগকে দেহের বন্ধন হইতে মুক্তি দান করে, আবার এই নৃত্যচ্ছন্দেই রূপের মোহ বা ভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া অন্তরস্থিত অদ্বৈতসত্তাকে আমাদের অনুভব হইতে আড়াল করিয়া রাখে। অর্থাৎ বাহিরের রূপকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিয়া আমরা দেহের মোহে নিপতিত হই। ভুলিয়া যাই যাহাকে দেহ বলিয়া জানিতেছি রূপ বলিয়া জানিতেছি, তাহা যথার্থ অরূপের, অদ্বৈত শিব সুন্দরের, অর্থাৎ অনন্ত প্রাণের লীলা চঞ্চলতা।

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্ব তনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব নাচের দোলায়
বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে"

(নটরাজ ঋতু রঙ্গশালা)

এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শান্তি নিকেতনের এক বাণীতে অন্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

"প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবল মাত্র রং,......... মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য্য, তাই বিনা প্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙীন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।............আমার কাছে এইটিই বড় আশ্চর্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃরির দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির—একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের—বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি.........বাহিরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।"

(শান্তি নিকেতন)

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি কবির চোখ এমন কোন নক্ষত্র দেখেন নাই যে নক্ষত্র কিরণ তাঁহাকে বহিরাকাশ হইতে সৃষ্টির অন্তরালস্থিত এক রহস্যলোকে লইয়া যায় নাই, যে রহস্যলোকে চির সুন্দর চির জ্যোতিষ্মান আপন মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। এই সম্বন্ধে কবি যাহা বলিতেছেন তাহাই প্রনিধান যোগ্য।

"এই যে মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারা পতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে।.........আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নাই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন কোরতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলি করুণ গান জেগে উঠ্ছে :—

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া

প্রহরের পর প্রহর ধ'রে এই বার্তাই জানাচ্ছে, ওরে তুই যে বিরহিনী—তুই বেঁচে আছিস কী ক'রে তোর দিন রাত্রি কেমন ক'রে কাটছে?

সেই চিরদিন রাত্রির হরিকে চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হোতে চাচ্ছে না।

আমরা যে তাঁরই বিরহে এমন কোরে কাটাচ্ছি এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। *

খবর আমাদের দেয় কে? ঐ যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে কোরছে, তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, যারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর একজন বাঁধা থেকে দিন রাত্রি কেবল বোবার মত কাজ কোরে যাচ্ছে—তারাই।…যে সব খবরকে কোন ভাষা দিয়ে বলা যায় না সে সব খবরকে এরাই তো চুপি চুপি ব'লে যায়—এবং মানুষ কবি সেই সব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায় কতকটা সুরে বেঁধে গাইতে থাকে।

"ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

আজ কেবলি মনে হচ্ছে এই যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার অনন্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণ ধারা। যতদূর চেয়ে দেখি আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহ সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বল্‌ছে—কৈ সে—গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।"

(শান্তি নিকেতন)

খণ্ড রূপকে ঘট নামে অভিহিত করা হয়। ঘটের মধ্যে যে সূর্য্য রশ্মি প্রতিফলিত হয় তাহা বিরাট আকাশের সূর্য রশ্মি ছাড়া

* অধ্যাপক শ্রীসুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিদ্যাপতির উদ্ধৃত কাব্যাংশ উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—"মত্ত দাদুরির ডাকের সঙ্গে রাধিকার বেদনার সংযোগ কোথায় তাহা স্পষ্ট হয় নাই।" শ্রাবণের ধারা-বর্ষণের মধ্যে সমস্ত আকাশ কাঁদিয়া যে ব্যর্থার বিরহব্যথাকেই প্রকাশ করিতেছে এই সত্যটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির উল্লিখিত কবিতায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কোন্‌টা সত্য?

আর কিছুই নহে। ঘটের অভ্যন্তরস্থিত রশ্মির পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই। তরুলতা, মানুষ, মানুষেতর জীব, আকাশের জ্যোতিষকমণ্ডলি, বিশ্বের অনুপরমানু এইরূপ ঘট বিশেষ, ইহাদের মধ্যে যে প্রাণের ও রূপের সন্ধান পাই তাহাও সেই বিরাট প্রাণেরই প্রতিফলন।

"পূরবী" কাব্যগ্রন্থের 'আহ্বান' নামক কবিতাটি এই তত্ত্বকেই সমর্থন করিতেছে।

"কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে, নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই সে চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণ স্পন্দ ছুটে চারি ধারে
বিপিনে বিপিনে
তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধুলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে ;
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি
পত্র পুষ্প ভারে।

* * *

তুমি সে আকাশ ভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্তের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকুতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি নারী
দু' বাহু বাড়ালে।"

স্বর্গের আলোক আমাদের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগায় এবং আমাদের মাটির দেহের প্রাণ অখিল প্রাণের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করিয়া তাহার মধ্যে আপনাকে বিলুপ্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

"পূরবী" 'বলবানী—' ও 'নটরাজ ঋতু রঙ্গশালার' কবি তবু বর্হিপ্রকৃতির খণ্ড রূপকে স্বীকার করিয়াছেন। স-সীমকে ঘিরিয়া অসীমের লীলা চলিয়াছে এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু 'বলাকার' কবি সসীম প্রকৃতির অস্তিত্বই একরকম স্বীকার করেন নাই। সেই যুগে কবির চেতনায় সীমা অসীমের মাঝখানের কল্পিত রেখাটি একেবারে যেন মুছিয়া গিয়া সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি কেবল অদ্বৈত প্রাণের লীলারূপেই উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই যুগে প্রকৃতির পানে তাকাইয়া তিনি রূপের ব্যাখ্যা করেন নাই, রূপ অরূপের সন্ধান দিতেছে বলিয়া তার বন্দনা গীতি রচনা করেন নাই, তিনি গাহিয়াছেন অদ্বৈত প্রাণের বন্দনা। স্থানু পর্বত তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া উড়িয়া যাইতেছে, চঞ্চলা নদীকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকেই তিনি বলিতেছেন —

"শুধু ধাও, শুধু ধাও শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও।"

"নৈবেদ্য" কাব্যগ্রন্থের 'প্রাণ' নামক কবিতাটিতে কবির ও বিশ্ব প্রকৃতির অদ্বৈত প্রাণের অনুভূতির কথাটি কবি আরও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার কথা পূর্ব্বেও উল্লেখ করা গিয়াছে। এইখানে কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধার করিলাম।

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গ মালা রাত্রি দিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে

লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে

* * * *

করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান
সেই যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।"

তাই বলিতেছিলাম প্রকৃতির মধ্যে কবি প্রকৃতিকে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন অদ্বৈত প্রাণকে, "বনবানীতে" যাহাকে কবি বলিয়াছেন শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

'কল্পনার' অন্তর্গত "বর্ষশেষ" কবিতাটি কবির এক অভিনব সৃষ্টি।

বাধাবন্ধহারা ঈশানের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের প্রলয়াভির্বাব, সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্যুৎ বিদীর্ণশূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উৎকণ্ঠিত বিহঙ্গের পক্ষ সঞ্চারণ, পশ্চিমের বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস, ধূসর পাংশুল মাঠ, ঊর্দ্ধমুখ ধেনুগণের ব্যাকুলতা, আর মুহূর্তমধ্যে উন্মাদিনী কালবৈশাখীর মত্ত হাহাকার, অভ্রভেদী গর্জন, সমস্ত গগন পূর্ণ করিয়া, ব্যাপ্ত করিয়া, লুপ্ত করিয়া পুঞ্জ পুঞ্জরূপে স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ঙ্করের আবির্ভাব, তার বিদ্যুৎ ভ্রুকুটি, ধরণীর বক্ষ বিদীর্ণকরা অজস্র বর্ষণ, চারিদিকে ফেনিল মৃত্যুতরঙ্গ, ধ্বংশ ভ্রংশ করা উন্মত্ত উদ্দাম গতি, স্বর্গে মর্তে ঘনঘোর প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা—সবই দেখিলাম। দেখিলাম সমগ্র বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া এক ঘনঘোর তমিস্রার প্রলয় গর্জনের মধ্যে কালবৈশাখীর ভয়াল ভ্রুকুটির তলায় নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। কালির অক্ষর-সীমার মধ্যে এত বর্ণ, এত ধ্বনি, এত আবেগ ও গতিকে যে বন্দী করা যাইতে পারে 'বর্ষশেষ' না পড়িলে বিশ্বাসই করিতাম না। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় কালবৈশাখী বিধাতার সৃষ্টি না রবীন্দ্রনাথের ?

কবি ডাক দিয়া বলিলেন—

"হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি

পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে

ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে

ঘন ঘোর স্তূপে।

কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেক দিক্-দিগন্তর

করি অন্তরাল

স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে

রহো ক্ষণকাল।"

কিন্তু কেন? সে কি কাল বৈশাখীর ভয়াল মধুর মূর্তিখানি অঙ্কিত করিয়া লইবার জন্য? দেব সেনাপতির করধৃত ধনুকের ঝনন্ রণন্ কান পাতিয়া শুনিবার জন্য?

এই ঝড়, এই বিদ্যুৎ ভ্রূকুটি, অশনির গর্জন, এই ফেনিল মৃত্যুর পুঞ্জ পুঞ্জ তরঙ্গ কবিকে যে একেবারে উড়াইয়া লইয়া গেল সৃষ্টির অন্তরের এক অলক্ষ্য রহস্যলোকে। সেই অলক্ষ্যলোকে চলিয়াছে জীবন মৃত্যুর অদ্ভুত খেলা। বিরাট বিশ্ব স্বরূপে সেথায় ভাসিতেছে ডুবিতেছে, পুরাতন সত্যের কঙ্কালের উপর নূতন সত্যের মঞ্জরী প্রতিমুহূর্তে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। বহিঃপ্রকৃতির আলোড়ন আবর্তন কবির চোখে মুছিয়া যায়, ভাসিয়া উঠে ইহাদের অন্তরালস্থিত ভাবমূর্তিগুলি, দিগন্ত প্রসারিত কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ প্রভায় মুহূর্তের মধ্যে সেই ভাবলোক, সেই রসলোক, সেই সত্যস্বরূপ কবির চোখে চম্‌কাইয়া যায়—

"উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের

জ্বলদর্চি রেখা

করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানিনা

কী তাহাতে লেখা।"

সারা ভুবন ব্যাপিয়া মৃত্যুলীলা চলিয়াছে। এমনি অজস্র মৃত্যুর উন্মত্ততা কবিকেও ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে না কেন? রুদ্ধ ঘরের সীমিত জীবনকে ধ্বংশ করিয়া, স্থূল অভ্যস্থ লাভ ক্ষতির সংসার হইতে ভ্রংশ করিয়া কেন এমনি মৃত্যু শ্যেন পক্ষীর মত

উড়াইয়া লইয়া স্থান কালের গণ্ডী পার করিয়া লইয়া যাইতেছেনা সেই লোকাতীত লোকে, বিরাট বিশ্বের সত্যস্বরূপকে যেখানে দাঁড়াইয়া চোখ ভরিয়া দেখা যায় ?

"মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি--
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।"

* * *

"যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।
শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ক কুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে॥"

মৃত্যু না হইলে বিশ্বদেবতার সঙ্গে একাত্মভূত হওয়া যায়না, মৃত্যু মাটির বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া জড় চঞ্চল প্রকৃতির অন্তরালস্থিত শান্তম্ শিবম্ সুন্দরমের নিরঞ্জন সত্তার মধ্যে আমাদের সীমিত অস্তিত্বকে লোপ করিয়া দেয় ; সেই বিরাটের মধ্যে যুগযুগান্ত কাল, কালের রূপপুঞ্জ যে অখণ্ড অরূপ অচঞ্চল বিশ্বাত্মারূপে বিরাজ করিতেছে। তাইত কবির জীবনদেবতা বার বার মৃত্যুকে পাঠাইয়াছে কবিকে পার্থিব সকল বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার জন্য।

"আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চির সুন্দরের সুর-পুরে।
চিরকাল তবে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে ?
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয় ;

পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ড পলগুলি,
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথ প্রান্তে ধূলি
আমি-যে রূপের পদ্মে ক'রেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।"

(পুরবী—কঙ্কাল)

মৃত্যুরূপ মহৎ সর্বনাশের পরপারেই আমার অনন্ত, তাই ত কালবৈশাখী মৃত্যুর দূত রূপে আজ উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পুরবীর "বৈতরণী" কবিতাটির তাৎপর্য প্রণিধান করিলে এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রসিদ্ধি আছে মৃত্যুর পর জীবকে বৈতরণী নদী পার হইতে হয়। পুরাণে সেই নদীর বর্ণনা আছে তপ্তা বৈতরণী নদী। এই কবিতাতে সেই পৌরাণিক কল্পনার আভাষ রহিয়াছে।

প্রাণের অরণ্য-তট হতে
দণ্ড পল খসে খসে পড়ে তব অন্ধকার স্রোতে।
রূপের না থাকে চিহ্ন, নাহি থাকে বর্ণের বর্ণনা
বাণীর না থাকে এক কণা (পৃথিবীর চঞ্চলা নদীর ইহা
বিপরীত—বলাকার 'চঞ্চলা' দ্রষ্টব্য)

বিশ্ব প্রকৃতির চঞ্চল খণ্ডরূপের অন্তরালে যে একটা বিদেহী সত্তা রহিয়াছে, অজস্র স্রোতধারার মত যে সত্তার মধ্যে খণ্ড রূপময় জীব ও জড় দেহগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, শাস্ত্রে সেই অখণ্ড সত্তাকে বলা হইয়াছে অপরা প্রকৃতি। বৈতরণী ঐ অপরা প্রকৃতির রূপক। এই অপরা প্রকৃতিকেও লঙ্ঘন করিয়া স্থির সত্তা একমেব সদ্বস্তু পরম ব্রহ্মকে লাভ করিতে হয়। এই তত্ত্বের পরিচয় দিতেছে এই বৈতরণী কবিতা

"ওগো বৈতরণী
অদৃশ্যের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী
সেথায় নির্জনে
দেখি আমি আপনার মনে
তোমার অরূপ-তলে সব রূপ পূর্ণ হ'য়ে ফুটে
সব গান দীপ্ত হ'য়ে উঠে
শ্রাবণের পরপারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।"

এখন আমরা বুঝিতে পারিব কবি কালবৈশাখীর তরঙ্গিত মৃত্যুর স্রোতে পাড়ি দিয়া কোন্ পথের প্রান্তে পৌছিয়া যুগযুগান্তের বিরাট স্বরূপকে নিরীক্ষণ করিতে চাহেন।

কালবৈশাখীর কোলাহল যতই ভীষণ হউক না কেন তথাপি তাহাই চরম নহে, আসল জিনিষটা শান্তম্। তাহাই ভিতরে আছে, আদিতে আছে, শেষে আছে। সেই মূর্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত। তরঙ্গ যখন শান্ত হয়, সমুদ্রের তখনো কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপর প্রকৃতির যতই ওলট পালট হইয়া যাক্ তথাপি স্বরূপতঃ সমস্তই ধ্রুব হইয়া আছে। কিছুই নড়েনি। আদিতে শিবম্, অন্তে শিবম্ এবং অন্তরে শিবম্।

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান

রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যগ্রন্থটির আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক বের্গসঁর গতিবাদের সঙ্গে বলাকার কবিতাগুলির তত্ত্বগত কিছু ঐক্য রহিয়াছে। কিন্তু ঐক্য যতটা রহিয়াছে অনৈক্য তদপেক্ষা বেশী। তথাপি পাঠক মাত্রেরই মনে এই দুই মনীষীর চিন্তাধারার সাদৃশ্য প্রতিভাত হয় বলিয়া এদুইএর তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন। বের্গসঁর গতিবাদ জটিল তত্ত্ব, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে, এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনও নাই। বলাকার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটাই আমরা আলোচনা করিব।

গতিবাদী বের্গসঁ বিশ্বপ্রকৃতিকে একটি রকেটের সঙ্গে তুলনা দিয়া বলিতেছেন হাউই বাজি যেমন আপনার অন্তরস্থিত Energyর আবেগে আপনি উৎক্ষিপ্ত হয়, বিশ্বপ্রকৃতিও আপনার আবেগে আপনি নিত্য পরিবর্ত্তনের স্রোতে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। এই গতি-চঞ্চলতাই বিশ্বপ্রকৃতি। চর্মচক্ষুতে আমরা যে বস্তুনিচয় প্রত্যক্ষ করি সেইগুলিও গতির রূপান্তর মাত্র। বিদেহী গতি ঘূর্ণাবর্তে ঘনীভূত হইয়া স্থির বলিয়া আমাদের ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে। বিশ্বে স্থিরত্ব বলিয়া কিছুই নাই, স্থিরত্বের ধারণা আমাদের ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। এই গতি কোনো স্থিরত্বের বিকার নহে, এই গতি অনাদি ও অনন্ত, স্বয়ম্ভু, স্বয়ংসিদ্ধ ও নিরালম্ব। আমরা গতি বলিতে সাধারণতঃ বুঝি কেহ একজন চলিতেছে, বের্গসঁর মতে এইখানে "একজন" বা Ego বলিতে কিছুই নাই, কোনো Ego বা ব্যক্তিসত্তা যে অনন্তগতির স্রোতে ভাসিতেছেন এমন নহে, চলার পুরুষ বলিয়া কেহ নাই, কেবল চলাটাই আছে। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি একটা

নিরবচ্ছিন্ন 'কিছু না'-র গতি। কেবলমাত্র গতিই বিশ্ব। এই গতির কোনো লক্ষ্যও নাই। লক্ষ্য বলিতে কোনো স্থির বস্তুর কল্পনা আসিয়া পড়ে। গতি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অতএব গতির গতিই লক্ষ্য।

বলাকা কাব্যগ্রন্থে কবি সমগ্র বিশ্বকে একটি অজস্রবাহিনী নদী-রূপে কল্পনা করিয়া বলিতেছেন বিশ্ব অবিরাম গতির আনন্দে নৃত্যছন্দে চলিয়াছে, এই চলার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। বিশ্বে এই চলার ছন্দে নিরন্তর পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিয়াছে। আবার বলিতেছেন সমগ্র বিশ্ব যেন একটি বলাকা, অবিরাম উড়িয়া চলিয়াছে, বিশ্বের অণুতে অণুতে কেবল এই একটি সঙ্গীতই ধ্বনিয়া উঠিতেছে—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে'। বিশ্বের প্রতি অণু রূপান্তরিত হইবার জন্যই যেন সদা উন্মুখ। এই পর্য্যন্তই বলাকার বাণীর সঙ্গে বের্গসঁর গতিবাদের সাদৃশ্য। কিন্তু কবি গতিকে স্বীকার করিয়াও গতির একটি লক্ষ্যকে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। এমন একটা যায়গা নিশ্চয়ই আছে যেখানে বলাকার পাখার চঞ্চলতা শান্ত হইয়া গিয়াছে, নদী নিশ্চয় বিরাট এক সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আপনার আবেগকে পরিহার করিয়াছে। এই লক্ষ্য কি? এই সমুদ্রই বা কি? বলাকার কবি ঈশ্বরবাদী-কবি। গতিতত্ত্ব বের্গসঁ ইউরোপকে শুনাইয়াছেন কিন্তু এই তত্ত্ব ভারতের দার্শনিকদের যে অজ্ঞাত ছিল না তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। অজ্ঞাত থাকিলে তাঁহারা বিশ্বকে জগৎ নাম দিতেন না। নিত্য গতিশীল বলিয়াই ইহা জগৎ নামে আখ্যাত। কিন্তু ইঁহাদের মতে বিশ্বপ্রকৃতির আবেগ চঞ্চলতা স্বয়ম্ভুরও নয়, নিরালম্বও নয়, বরং তাহার বিপরীত। এক চিৎ-ঘন সত্তা যিনি আদিতে ছিলেন বিদেহী, নির্গুণ তিনি অজ্ঞাত কারণে সগুণ হইয়া মৃৎ-ঘন চঞ্চল প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। এই চঞ্চলতার অন্তরালে সেই চিন্ময়সত্তা শান্ত স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই গতি চঞ্চলতা তাঁহার নিত্য স্বরূপ নহে, ইহা তাঁহার নিরঞ্জন সত্তার বিকার মাত্র। এই পুলকিত স্থির সত্তা কি প্রকার? সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ।

একটি উদাহরণের দ্বারা কথাটি স্পষ্ট হইবে। জগৎরূপ রকেট্‌টি যদি কেবল 'কিছুনা'-র' গতি হইত, বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য বের্গস ও 'কিছুনা' (Nothing) হইতেন এবং Elan Vital মতবাদ ছাপার হরপে বাহির হইত না। বের্গস রকেটের মত কেবল বিক্ষিপ্ত বা উৎক্ষিপ্ত হইতেন, সেই বিক্ষেপ বা উৎক্ষেপ সম্বন্ধে 'কিছুনা বের্গস' সচেতন হইতেন না।

সচেতন হইবে কে? 'কিছুনা' 'কিছুনা'—সম্পর্কে সচেতন হয় কি করিয়া? বিশ্বচরাচরে ব্যক্তি পুরুষ, Ego বা Personality বলিয়া কেহইত নাই, বিশ্বচরাচর গতিমাত্রসার, বের্গস কি চরাচরের বাইরের কেহ? বৈজ্ঞানিকের ল্যার্বটারির প্রয়োজন কি? হাতের কাছে আমাদের চিত্তরূপ ল্যার্বটারি খানা ত রহিয়াছেই; বের্গস তাঁহার চিত্তরূপ ল্যাবটারিখানাতে প্রবেশ করিয়া দেখুন তিনি 'কিছুনা-র' গতিমাত্র সার কিনা? বিদ্যুতের পাখার মত, রকেটের মত তিনি কি কেবল ঘুরিতেছেন? না তিনিই যে পাখা এবং তিনিই যে ঘুরিতেছেন এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্যই কেহ তাঁহার মধ্যে বসিয়া আছে। এই জ্ঞানী পুরুষটি কে?

আমি জগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ঘুরিতেছি, ঘোরা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া গতিবাদ আবিষ্কার করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতেছি এবং সেই ঘোরার আবর্তে অন্তরে বাহিরে যে আলোড়ন জাগিতেছে তাহা অনুভব করিয়া আনন্দিত ও হইতেছি। আমার মধ্যে কত বর্ণচ্ছটা, কত বিচিত্র অনুভূতির অনুরণন অনুক্ষণ ভাসিতেছে, মিলাইতেছে, আমি সচ্চিদানন্দ।

আসল কথা এই যে শান্ত শিব সুন্দর (যাহা শায়িত বা লীন হইয়া আছে তাহাই শিব) মৃৎ-ঘন চঞ্চল প্রকৃতির অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন, মৃৎ-চঞ্চলতার পশ্চাতে তিনিই চিৎ; শাশ্বত সনাতন। (আমাদের মাটির দেহের প্রতি অনু চঞ্চল, শান্ত শিব এই দেহে কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন একমাত্র যোগী জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন) কবি বলিতেছেন এই শান্ত শিবই গতির

মধ্যেও স্থির থাকিয়া ক্রমাগত চঞ্চলতাকে স্থিরত্বের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। এই স্থির অচল পুরুষটিই শাশ্বত অর্থাৎ নিত্যসত্য। ত্রিগুণাত্মক হইয়া ঘূর্ণ্যমান প্রকৃতিরূপে সেই সৎ-সত্তার অতি সামান্য অংশ পরিদৃশ্য হইয়াছে। সেই সামান্য অংশটুকুই আমাকে তোমাকে লইয়া এই বিশ্বজগৎ। অতএব বের্গসঁ, আমি, তুমি ইহাতে গতি ছাড়া আর কি দেখিব? কিন্তু এই প্রকাশই সেঁই সদ্বস্তুর পূর্ণ প্রকাশ নয়। আমার আমিত্বের সব-টা দৃশ্য হয় নাই। চলমান আমি পূর্ণ আমি-র একাংশ মাত্র।

"অথবা বহু নৈতেন কিং জ্ঞাতেন গুবার্জ্জন।
বিষ্টভ্যাঽহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতোজগৎ।"

(গীতা)

এই খণ্ডাংশ সেই বিরাটে যেদিন লীন হইবে সেইদিন আর অপূর্ণতা জনিত গতি চঞ্চলতা থাকিবে না।

"কত চতুরাণন মরি মরি যাওঅত
ন তুয়া আদি অবসানা
তোহি জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা"

(বিদ্যাপতি)

আর বলাকার কবি বিশ্বের চঞ্চলতার গান গাহিতে গিয়া বলিতেছেন—

"তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।"

আমার জীবনরূপ পদ্মটি কোন্ কৈলাসের মানস সরোবর হইতে উত্থিত হইয়াছে? মানস সরোবর একটিই আছে,—সেই সনাতন সত্য শিব।

"জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে
ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস সরোবরে।"

অতএব রবীন্দ্রনাথ কেবল গতির কথাই বলেন নাই, গতির অন্তরালস্থিত নিরঞ্জন স্থির সত্তাকে চিনিয়া লইয়া তাঁহাকেও অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস তাঁহার মৃন্ময় চঞ্চল খণ্ড প্রকাশ ঐ চিন্ময় অখণ্ডের মধ্যে একদা সাগর ঊর্মির ন্যায় লীন হইবেই।

"আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় প'রে
লবে মোরে, লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হ'তে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্মল আলোতে।"

সেই আকাশখানা রিক্ত কেন? কারণ খণ্ডরূপ সমূহ—সূর্য্য, চন্দ্র, তৃণ, মাটি, (অর্থাৎ প্রকৃতি) তথায় সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হইয়াছে। ইহা শূণ্যাবস্থা বলিয়াই "আকাশ"।

"নাইরে দিবশ নাইরে তাহার নিশা"
"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং।"

সৃষ্টি প্রলয়ে সংহত হইয়া নিগুর্ণ সত্তায় যখন ফিরিয়া গিয়াছে তখন আর দিবারাত্রি উদয়াস্ত কোথায়?

বলাকার এই সব কবিতা আমাদের জানাইয়া দিতেছে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উৎস পশ্চীমী গতিবাদ নহে, ভারতের স্থিরত্ব-বাদ।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রোমান্টিক কবি নহেন। Romanticism বলিতে আমরা যে সুদূরের পিপাসা বুঝি বা প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার সাদৃশ্যের বা সমধর্মীতার উপলব্ধি বুঝি রবীন্দ্র-মানস, রবীন্দ্র দৃষ্টি, তাহাকে শত যোজন পশ্চাতে ফেলিয়া বিশ্বের একেবারে সত্য স্বরূপকেই দেখিয়া লইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদী। শেলি, কীট্‌স্‌, ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ বা এমন কি অনন্ত জীবনে বিশ্বাসী ব্রাউনিংএর সঙ্গে তাঁহার তুলনা করিয়া তাঁহাকে বুঝিবার প্রয়াস কখনো সফল হইতে পারেনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমের কবিদের মধ্যে যে ঈষৎ অতীন্দ্রিয়

সৌন্দর্য-তন্ময়তা দেখা গিয়াছিল তাহার কোন সুদৃঢ় ভিত্তি ছিলনা, কোন সুনিশ্চিত দর্শন ছিলনা। আধ্যাত্মিকতার উহা আরম্ভ মাত্র, আভাস মাত্র, তাই শেলিকে উহা কেবল উন্মনাই করিয়াছে, কোন সত্যে অগ্রসর করিয়া দেয় নাই। কীট্‌স্ "সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য।"—জাতীয় কথা বলিয়াছেন বটে কিন্তু সত্য ও সুন্দর বলিতে তিনি প্রকৃতির বর্ণাঢ্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অথচ এই বস্তুটাই রবীন্দ্রনাথের চোখে একেবারে 'এহ বাহ্য'। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে যাঁহার পরিচয় নাই, বিশেষতঃ উপনিষদের বাণীগুলি যিনি অনুধাবন করেন নাই, তাঁহার পক্ষে রবীন্দ্রকাব্যের একটি ছত্রও উপলব্ধি করা দুরাশা। অধ্যাপক শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় লিখিতেছেন, "বিশ্ব-প্রকৃতিকে মনোবোচিত প্রবৃত্তির লীলা ভূমি কল্পনা করা ও প্রকৃতির সঙ্গে নরনারীর হৃদয়ের সংযোগে বিশ্বাস করা—ইহা রোমাণ্টিক কাব্যের গোড়ার কথা এবং এইজন্য রবীন্দ্রনাথ কোন মৌলিকতা দাবী করিতে পারেন না।" বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানবোচিত প্রবৃত্তির অস্তিত্বের আবিষ্কার খৃষ্টান ইউরোপে অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপার। কিন্তু ভারতবর্ষের সামান্য একটি গেঁয়ো কৃষকের নিকটও উহা কোন নূতন সংবাদ নহে। রবীন্দ্রনাথ কোন্ দুঃখে এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের মৌলিকতা দাবী করিবেন? তিনি যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কেবল মানবলীলা নহে, বিশ্বস্রষ্টার লীলাকেই দেখিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে ইংরাজী অলঙ্কার শাস্ত্রের মাপকাঠিটা একেবারে বর্জন করিলে কোন ক্ষতি হইবে না কিন্তু সেইটাকে ভুল যায়গায় ব্যবহার করিলে যথেষ্ট অনর্থের সম্ভাবনা। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর বর্ণনা দিতে গিয়া লিখিতেছেন—

'যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী'।

তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা গেল 'উর্বশী' প্রিয়া-মূর্তি। অর্থাৎ প্রেমের ঘণীভূত প্রতিমা। সকাম ও নিষ্কাম প্রেম উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপা।

রবীন্দ্র-মানসের 'রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী' শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই উর্বশী প্রতিমার তাৎপর্য্য পুঙ্খানু পুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করা গিয়াছে। সকাম ও নিষ্কাম প্রেমের প্রতিমা বলিয়াই যে ইঁহার দক্ষিণকরে সুধার পাত্র ও বাম করে বিষভাণ্ড কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের এই 'উর্বশী'-কল্পনার সঙ্গে Shelleyর Hymn To Intellectual Beauty কবিতার কোথাও কোন সাদৃশ্য নাই। Shelleyর কবিতা প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া নহে, beauty বা সৌন্দর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া, তাহাও আবার Intellectual beauty! Intellectual beauty আর প্রেম এক বস্তু নহে। 'উর্বশী' যদি beautyর প্রতিমা হইতেন, রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ beautyর একটি চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিতেন কিংবা কোনখানে সৌন্দর্য্য শব্দটিও ব্যবহার করিতেন। তাহা না করিয়া তিনি ব্যবহার করিয়াছেন 'প্রেয়সী' শব্দ। প্রেয়সী সুরূপা হইতে পারেন, কিন্তু তাহা অন্য কথা। আমাদের দেখিতে হইবে তাঁহার লক্ষ্য সৌন্দর্য্য, না, সকাম-নিষ্কাম কামনা। যদি যথার্থ সৌন্দর্য্য হইত তাহা হইলে উর্বশীকে 'যুগ-যুগান্তরের প্রেয়সী না বলিয়া যুগ-যুগান্তরের 'রূপসী' বলাই সমীচীন হইত। তারপর উর্বশীর "মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল"—জাতীয় কথার সঙ্গে Intellectual beautyর কি সম্পর্ক ররিয়াছে? Intellectual beautyর প্রভাবেই কি মুনিগণের ধ্যান ভঙ্গ হয়? অধ্যাপক মহাশয় লিখিতেছেন "সুন্দরের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে.........।" প্রথমতঃ এই কথাটি একেবারে অর্থহীন, দ্বিতীয়ত absolute beautyর অভাব রবীন্দ্রনাথ কোন দিন বোধ করেন নাই, বরং চিরকাল তিনি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে দেখিয়াছেন। বনানীর সামান্য একটি বৃক্ষের পশ্চাতেও তিনি সত্য শিব সুন্দরকে দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রেয়সীর আঁখি-তারকাব মধ্যে অনন্ত আত্মার দীপশিখা অনির্বাণ জ্বলিতেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই ত এইখানে। Shelley ব্যক্তিগত জীবনে পার্থিব প্রেমের ব্যাপারে নিরাশ হইয়াছিলেন, বাস্তবতার মধ্যে-

যে অরূপ রতন সংগোপনে রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিতে না পারিয়া মাটির পৃথিবীকে চিরকাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদও তৎকালে সমর্থন লাভ করে নাই, এই সকল কারণে তিনি দুঃখবাদী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার পক্ষে মাটির পৃথিবীতে absolute beautyর অভাবের কথা বলা এবং তাহার জন্য আক্ষেপ করা স্বাভাবিক। কিন্তু absolute beauty জীবন-দেবতারূপে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। এমন যে কদর্য কঙ্কাল (পুরবী) তাহার মধ্যেও ত তিনি অনন্ত জীবনের আনন্দমুঞ্জরী নিরীক্ষণ করিয়া ভাব-ব্যাকুল হইয়াছেন।

আমি পাঠকদের উর্বশী ও Shelleyর Hymn To Intellectual Beauty পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিতে বলি। তাঁহারা যদি উভয়ের কোন সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া দিতে পারেন কৃতার্থ বোধ করিব। ..

তারপর অধ্যাপক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বর্ষশেষ' কবিতাটির সঙ্গে Shelleyর Ode To The West Wind কবিতাটির তুলনা করিয়া বলিতেছেন—"Ode To The West Wind ও বর্ষশেষ—ইহাদের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে যে এইদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে পারে নাই। শেলি প্রবেশ করিয়াছেন কাল বৈশখীর অভ্যন্তরে এবং তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিরা নববেশে সজ্জিত করিয়াছেন। এই বহিরাবরণের অন্তরালে রহিয়াছে কালবৈশাখীর অমানুষী শক্তি যাহার বলে বিবর্ণ বিশীর্ণ শুষ্ক পত্র আলোড়িত হয়, বর্ষণ-ভারাক্রান্ত বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ সঞ্চালিত হয় এবং ভূমধ্যসাগরের সুগভীর স্বপ্ন চূর্ণ হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ ও প্রাণের উন্মাদনা—ইহাদের অপূর্ব্ব সম্মিলনে শেলি নবপুরাণ সৃষ্টি করিয়াছেন। শেষের দিকে তিনি তাঁহার নিজের জীবনের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এই নবপুরাণ সৃষ্টি ব্যাহত হয় নাই। শেলি কালবৈশাখীর মধ্যে আপনাকে লীন করিয়া দিতে চাহিয়াছেন।......

'বর্ষশেষ' কবিতাটিতে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বর্ণনা দিয়াছেন কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় ধূসর পাংশুল মাঠ ও নদীপথের ত্রস্ত তরীর। এই বর্ণনায় প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ প্রাণের স্পন্দন নাই, ইহা একেবারে বহির্জগতের সাধারণ বর্ণনা, শুধু শব্দ ও অলঙ্কারের আতিশয্যেই চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছে।............এই বর্ণনায় কোথাও বৈশিষ্ট্য নাই। শেষের দিকে কবি নূতনকে আহ্বান করিয়াছেন, কাব্য হিসাবে এই অংশ আরও নিকৃষ্ট। কবি জানেন না যে নূতন কি বিশিষ্ট বাণী আনিবে এবং তাহার সঙ্গে ঝড়ের কি সম্বন্ধ তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।............ছন্দের ঝঙ্কারে ভাবের দৈন্য ঢাকা পড়ে নাই।"

অধ্যাপক মহাশয় ইংরেজীর অধ্যাপক, অতএব Ode To The West Wind এবং "বর্ষশেষ" কবিতা দুইটির প্রত্যেকটি যে তিনি পাঠ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার অবসর নাই। প্রথমতঃ Ode To The West Windএর কথাই ধরা যাউক।

Ode To The West Windএর প্রথম স্তবকে শেলি West windএর শক্তির বর্ণনা দিতেছেন।

"হে পশ্চিমাপবন! তুমি শরৎ ঋতুর নিঃশ্বাস, তুমি অদৃশ্য থাকিয়া মৃত পত্রগুলিকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছ। হল্‌দে, কালো, পাংশুল এবং তাম্রাভ মৃত রুগ্ন পত্রগুলি কোন যাদুকরের তাড়নায় কতকগুলি অশরীরী প্রেতাত্মার মত উড়িয়া যাইতেছে, তুমি পাখাযুক্ত বীজগুলিকে শীতঋতুর অন্ধকার কবরে লইয়া যাইতেছ, সেথায় তাহারা শীতল ও নির্জীব হইয়া শবদেহের মত বাস করে, যে পর্য্যন্ত না বসন্তের নীলবর্ণা ভগ্নী আবার স্বপ্নালু পৃথিবীতে তাহার বীণা বাজাইয়া সুমিষ্ট মঞ্জরীগুলিকে পবন দোলায় দলে দলে জাগাইয়া তুলে এবং পাহাড় ও সমতল ক্ষেত্রকে সজীব বর্ণে ও গন্ধে পরিপূর্ণ করে। ওহে সর্ব্বত্রগ মত্ত শক্তি! সংহারক ও রক্ষক! শোন! শোন!

দ্বিতীয় স্তবকে পশ্চিমী বায়ুর একটি অপূর্ব্ব শারিরীক বর্ণনা, একটি অনিন্দ্যসুন্দর ছবি। "ওহে পশ্চিমী বায়ু! তোমার স্রোতের উপর

গভীর আকাশের আলোড়ণের মধ্যে ছেঁড়া মেঘগুলি পৃথিবীর ছিন্ন পত্রের মত ভাসিতেছে—ইহারা আকাশ ও সমুদ্রের ঘন নিকুঞ্জ হইতে যেন ঝরিয়া পড়িয়াছে—ইহারা বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির দেবদূতী, আসন্নপ্রায় ঝড়ের কেশগুলি তোমার সুনীল বায়বীয় স্রোতে ভাসিতেছে—এই কেশগুলি যেন Maenad নাম্নী পরীর মস্তকের উৎসারিত কেশদাম—দিকচক্রবালের শেষপ্রান্ত হইতে আকাশের কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত ছড়ানো। তুমি মৃতপ্রায় বৎসরের শোকগীতিস্বরূপ। আজকের শেষ রাত্রি সেই পুরাতন বৎসরের কবরস্তম্ভস্বরূপ। সেই গম্বুজের অভ্যন্তরভাগে তোমার ঘনীভূত বাষ্প—যাহা ঘন বাষ্প, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ এবং শিলাবৃষ্টির সৃষ্টি করিবে। এ হেন পশ্চিমী বায়ু তুমি ! শোন ! শোন !

তৃতীয় স্তবকে সমুদ্রের অভ্যন্তরে ও উপরিভাগে পশ্চিমী বায়ুর আবির্ভাব ও কার্য্যের বর্ণনা, "নীল ভূমধ্যসাগরকে তুমি নিদাঘের স্বপ্ন হইতে জাগাইয়া তুল,—যে-ভূমধ্যসাগর তাহার স্বচ্ছ স্রোতের কলরবে ঘুমাইয়াছিল—প্রস্তর দ্বিপের ধারে Baiala উপসাগরে। যে ভূমধ্যসাগর ঘুমের মধ্যে তাহার অভ্যন্তরস্থ প্রাসাদ ও স্তম্ভগুলির পানে তাকাইয়া থাকিত। ইহারা তাহার তরঙ্গের প্রখরতর আলোকে কাঁপিতে থাকিত। এই প্রাসাদ স্তম্ভগুলি নীল শেওলা ও পুষ্প আচ্ছাদিত, এইগুলির পরিমল এত মধুর যে তাহাদের কথা ভাবিতেও স্নায়ু আবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। হে পশ্চিমী বায়ু ! আটলান্টিক সাগরের তরঙ্গগুলি তোমার পথ করিয়া দেয়। সমুদ্রের তলদেশের গাছপালাগুলি তোমার ধ্বনি শুনিতে পায় এবং অকস্মাৎ ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া যায়, কাঁপিয়া উঠে এবং ভাঙ্গিয়া পড়ে। তুমি শোন !"

পশ্চিমী বায়ুর বর্ণনা এই তিন স্তবকেই শেষ হইল। তারপরের দুই স্তবকে কবি নিজের কথা পাড়িলেন। উল্লিখিত তিনটি স্তবকে যতগুলি চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন প্রত্যেকটি এখন নিজের উপর আরোপ করিতে লাগিলেন—"আমি যদি মৃত পাতা হইতাম, তুমি আমাকে বহন করিতে পারিতে, যদি আমি দ্রুতগামী মেঘ হইতাম তোমার সঙ্গে উড়িতে পারিতাম, যদি তরঙ্গ হইতাম তোমার দ্বারা

পিষ্ট হইতে পারিতাম, তোমার শক্তির অংশ নিতে পারিতাম, হে দুর্দমনীয়! সেই ক্ষেত্রে একমাত্র তোমাহইতেই আমার অবারিত শক্তি কিছু কম হইত। কিংবা আমার শৈশব কালের মত যদি কেবল তোমার আকাশযাত্রার সাথী হইতে পারিতাম সেইক্ষেত্রে আকাশের জ্যোতিষ্কদের গতিকে অতিক্রম করা কিছুমাত্র স্বপ্নের ব্যাপার' বলিয়া মনে হইতনা, তাহা হইলে আজকে এমন করিয়া নিতান্ত প্রয়োজনে তোমার কাছে প্রার্থনা জানাইতাম না। তরঙ্গের মত, পাতার মত, মেঘের মত আমাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লও। আমি জীবনের কণ্টক শয্যায় শয়ন করিয়া আছি। আমার দেহ হইতে রক্ত ঝরিতেছে। তোমারই মত আমি আশাসনীয়, চঞ্চল এবং গর্বিত, অথচ সেই আমাকেই জীবনের ভার শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে।"

"আমাকে তোমার বীণাতে পরিণত কর; যেমন বনানীকে করিয়াছ, আমারও পাতা ঐ বৃক্ষপত্রের মত ঝরিয়া পড়িতেছে, বনের মত আমার মধ্য হইতেও তোমার ভয়ঙ্কর সঙ্গীত শরতের গম্ভীর সুর লাভ করিবে, যদিও সেই সুর করুণ।"

"হে ভয়ঙ্কর শক্তিধর! তুমি আমার শক্তি হও, ওহে অহঙ্কৃত! তুমি আমার হও, আমার নিষ্প্রভ চিন্তাগুলিকে মৃত পত্ররাজির মত বিশ্বে ছড়াইয়া দাও, আমার মুখে তুমি সুপ্ত পৃথিবীকে এক ভবিষ্যৎ বাণীতে উদ্বোধিত করিবার জন্য বাঁশরী স্বরূপ হও—ওহে পবন! যদি শীত আসিয়া থাকে, গ্রীষ্ম আসিতে কতদিন?

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ, ক্লাসের পাঠ্য Oxford University Press হইতে প্রকাশিত C. B. Young সঙ্কলিত Great English Poems নামক পুস্তকে এই কবিতার তাৎপর্য্য ও চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা উদ্ধার করিয়া দিতেছি—"This poem of 1819 is one of the finest of Shelley's lyrics. It combines with the highest degree of imaginative quality," writes Herford, "the two other characteristic notes of Shelley's

lyrics—personal despondency and prophetic passion. He faints and fails like a dead leaf... .... But these faltering accents become trumpet tones as soon as he utters, not his own sorrow, but the woes of man. Then the weary child becomes a prophet. The passion of the poet communicates itself to the very metre, which sweeps along with elemental rush of the wind, it celebrates.

Arthur Compton Rickett প্রণীত History of English literature গ্রন্থে এই কবিতা সম্পর্কে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ও উদ্ধার করিয়া দিতেছি। "The ode to the west wind is not greater artistically—that were impossible; (শেলির cloud কবিতার তুলনায়) but it has an intellectual and human interest. The logical development of the imaginative idea is so admirable that it deserves the fullest attention. Walking along the banks of the Arno, the poet has seen from the wood hard by the rising autumnnal storm carrying with it its frieght of leaves. Surging along comes this beneficent destroyer, scattering the black, scarlet, and yellow leaves far and wide. "The wild spirit" is then both "a destroyer and preserver". As the wind purifies the woods, so does the wind sweeten the sky, clarify the ocean, and make stronger and sounder the heart of man. With each fresh variation of the original thought the poet gives us a flood of superb imagery, strengthening the main theme, never weakening by far fetched conceits. We pass in turn over earth, sky and sea, the music growing fuller and more magestic as the poem sweeps on, "O lift me as a wave, a leaf, a cloud." And as in the visible world so in the poet's soul the wind is both

destroyer and presever........"Drive my dead thoughts over the universe ....from the individual the poem passes to the universal. The old world must go, a new world must come with the spring, laden with fresh sweet promises for suffering humanity.

"O wind

If winter comes, can spring be far behind?"

Thus does this wonderful lyric end. There is no greater lyric in our language.

অতএব উল্লিখিত কবিতাতে কি কি পাইলাম ?

(ক) ইউরোপের শরৎকালের West wind গাছের মরা পাতাগুলিকে ধ্বংশ করে এবং ভাবী তরুশ্রেণীর বীজগুলিকে মাটির বুকে ছড়াইয়া দেয়, তাই সে সংহারক ও রক্ষক দুই'।

(খ) West wind প্রবাহিত হইবার সময় আকাশের মেঘ মালার চিত্র

(গ) শরৎকালীন রাত্রির চিত্র

(ঘ) কবির West wind এর মত স্বাধীন মুক্ত হইবার আকাঙ্খা প্রকাশ

(ঙ) ভূমধ্য সাগর ও আটলান্টিক সাগর গর্ভে West wind এর প্রবেশ এবং সাগর দ্বয়ের তলদেশের বর্ণনা।

(চ) তাঁহার ব্যক্তিগত দুঃখ

(ছ) তাঁহার বাক্যগুলি যাহাতে West wind-তাড়িত পত্ররাজির মত মানব সমাজে ছড়াইয়া পড়ে তাহার প্রার্থনা; মানব জাতির জন্য দুঃখ প্রকাশ

(জ) যদিও চারিদিকেই Shelleyর মতে নিরানন্দ, আনন্দের বসন্ত (শেলির স্বর্ণযুগ) যে আসিবেই তাহার প্রত্যাশা।

এখন পাঠকগণ অনুধাবন করুন; অধ্যাপক শ্রীসুবোধ সেন গুপ্ত

মহাশয় এই কবিতার ভাব ও ভাষার সে উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন উক্ত কবিতাটির মধ্যে তাহার সমর্থন আছে কিনা।

"শেলি প্রবেশ করিয়াছেন কালবৈশাখীর অভ্যন্তরে এবং তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া নববেশে সজ্জিত করিয়াছেন।"

ইউরোপের শরৎকালীন West wind শেলির হাতে কি নববেশ পাইয়াছে ? West wind এর সমগ্র দৈহিক বর্ণনাই ত অতিমাত্রায় বাস্তব। শেলির প্রত্যেক বর্ণনাই চিত্রধর্ম্মী। এখানে-ও পর পর অনেকগুলি ছবি রহিয়াছে।

"এই বহিরাবরণের অন্তরালে রহিয়াছে কাল বৈশাখীর অমানুষী শক্তি যাহার বলে বিবর্ণ বিশীর্ণ শুষ্কপত্র আলোড়িত হয়, বর্ষণ ভারাক্রান্ত বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ সঞ্চালিত হয়।"

এই বিশেষণ গুলি 'বর্ষশেষ' কবিতাতেও কি নাই ? বিশেষণ গুলি ত সেই কবিতা হইতেই লওয়া। পাতা ঝড়া, পাতা ওড়া কি যে কোন ঝড়ের অতি সাধারণ পরিচিত দৃশ্য নয় ?

"ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপ ও প্রাণের উন্মাদনা—ইহাদের অপূর্ব্ব সম্মিলনে শেলি নবপুরাণ সৃষ্টি করিয়াছেন।"

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপের কথা বুঝিলাম। এই কবিতায় যতটুকু বর্ণনার অংশ ততটুকু West wind প্রবাহিত হইলে আকাশে, পৃথিবীতে এবং সাগরে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহারই অতি পরিচিত চিত্র। কাহার প্রাণের উন্মাদনা ? West wind এর গতি আছে, বেগ আছে, এবং শক্তি আছে শেলি তাই ইহাকে wild spirit বলিয়াছেন।

কিন্তু শেলি আর West wind কি এক হইয়া গিয়াছে ? শেলি কোন সংযোগ দেখান নাই, দেখাইবার চেষ্টাও করেন নাই, যেমন আকাশ বিহারী Sky lark-এর সঙ্গে তেমন মুক্ত সর্ব্বত্রগ দুর্দমনীয় West wind এর সঙ্গে তাঁহার মুক্তিকামী অস্থির চিত্তের সমধর্ম্মীতা রহিয়াছে বলিয়া তিনি এই জাতীয় বস্তুকে উপলক্ষ করিয়া কবিতা লিখিতে ভালবাসিতেন, ঐ বস্তুগুলিকে উপলক্ষ করিয়া নিজের

কথাগুলি প্রকাশ করিবার সুবিধা হইত এই পর্য্যন্তই বুঝা যায়। শেলি যে-কোন কারণে পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তাই উন্মার্গধর্মী ক্রতিশীল উর্দ্ধলোকের কোন বস্তু দেখিলেই স্বভাবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেন। ইংরেজ সমালোচকেরা ইহাই কেবল বলিয়াছেন এবং তাঁহার চিত্রগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু West wind এর সঙ্গে তিনি একাত্মভূত হইয়া গিয়াছেন এমন কোন ভাব কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে কি? বরং কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন মাটির মানুষ হইয়া বড় অসুবিধা হইল, তোমার মত আকাশে উড়িতে পারিলামনা। বাচ্যার্থের অন্তরালে ইহার ব্যঞ্জনার্থ এই হইতে পারে যে শেলি জীবনে পৃথিবীর কঠিন বাস্তবতা হইতে যে মুক্তি খুঁজিয়াছিলেন তাহা পাইতে পারিলেন না। কিন্তু এই উক্তির পশ্চাতে বিশেষ কোন দর্শন নাই, ইহা রোমান্টিক কবির একরকমের উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইহার কারণ ও আছে, শেলি একাদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না, অন্যদিকে মাটির পৃথিবীতেও তাঁহার মন তৃপ্ত হইত না।

Edmund Gosse লিখিতেছেন "He is offen hectic, and sometimes hysterical."

Ideal বলিতে আমরা যাহা বুঝি এক ফরাসী বিপ্লবের Ideal ছাড়া তাঁহার অন্তরে অন্য কোন আধ্যাত্মিক ideal ছিলনা। সেইজন্যই "Shelley when he was not inspired and artist, was a prophet vaguely didactic or neurotically prejudiced he is the highest ideal of poetic ait produced by the violence of the French Revolution, but we are too canstantly reminded of that moral parantage, and his *sans culottism* is no longer exhilarating, it is merely tiresome.......(Edmund Gosse)

তাঁহার Ode to the west wind এ ও খানিকটা উচ্ছ্বাস ও আত্মবেদনার কথা প্রকাশ করিয়া শেলি If winter comes can spring be far behind (চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানি চ)—এই একটি কথা ছাড়া কোন প্রনিধাণ যোগ্য কথা বলিতে পারেন নাই।

কোথায় 'বর্ষশেষে' জীবনমৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে কবির মর্ম্মান্তিক আর্ত্তি, ভঙ্গুরের মধ্যে নিত্য সত্যের উপলব্ধি, নিখিল প্রাণের জোয়ার স্রোতে কবিচিত্তের সন্তরণ-প্রয়াস আর কোথায় দুঃখের পরে সুখ আসিবে, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ একদা মানব সমাজে বাস্তব হইয়া উঠিবে এই অস্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী—'vaguely didactic prophecy.'

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে ছবি ফুটাইবার চেষ্টা নাই। কিন্তু কবিতাটির নাম "বর্ষশেষ" "পশ্চিমাবায়ু" বা "কালবৈশাখী" নহে; নামের মধ্যে যে দুইটি কবিতার আকাশ পাতাল ব্যবধানের ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা শ্রীসুবোধ সেন গুপ্ত মহাশয় লক্ষ্য করেন নাই। শেলি বসিয়াছেন west wind এর বর্ণনা দিতে, আর রবীন্দ্রনাথ বসিয়াছেন বর্ষশেষ যে বাণী লইয়া আসিয়াছে তাহার কথা বলিতে। দুইটি কবিতার লক্ষ্যই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একটির সঙ্গে আর একটির ভাবগত, লক্ষ্যগত কোন ঐক্যই নাই, ভাবের কথা বলিতে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ দেহের বর্ণনাকে মুখ্য করিয়া তুলিবেন কেন? যদি তুলিতেন তাহা হইলেইত কবিতাটির অপমৃত্যু হইত। বর্ষশেষে হঠাৎ ঝড় আসিয়াছে, এই ঝড় প্রাচীনকে ধ্বংশ ভ্রংশ করিতেছে, পুরাতন সত্যকে নূতনের মধ্যে নবরূপে সঞ্জীবিত করিতেছে—সেই নূতন কি? তাহার মর্ম অনুধাবন করিতেই কবি ব্যস্ত, শেলির মত এলোচুল লইয়া তিনি মাতামাতি করিবেন কেন? রবীন্দ্রনাথ ঝড়ের বাহ্যিক রূপ বিশ্লেষণ করিতে, তাহার ছবি তুলিতে বসেন নাই···বর্ষশেষে ঝড়ের মৃত্যু তরঙ্গে যে বিরাট সত্য অকস্মাৎ বিদ্যুতের ন্যায় মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তাহাকেই কবি বন্দনা করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু সেই বিরাট সত্যকে জানিয়াও জানা যায়না, বুঝিয়াও বুঝা যায়না।

কবি বলিলেন—আমাকে মৃত্যু দাও, জড়দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সেই বিরাট সত্যের মুখোমুখী হওয়া অসম্ভব। যদি মৃত্যু হয়, দেহের বন্ধন ঘুচিবে, জড়ের জঞ্জাল লুপ্ত হইবে, দেহমুক্ত আত্মা তখন জড় জগতের অন্তর্বাহিনী প্রাণ-প্রবাহিনীকে অর্থাৎ বিশ্বের সৎস্বরূপকে নিরীক্ষণ করিতে পারিবে। বর্হিজগতে যে রূপের পরিবর্তন হইতেছে (যেমন আজকের ঝড় একরকমের পরিবর্তন আনিল) এই পরিবর্তনের যে নিগূঢ় তাৎপর্য্য রহিয়াছে তাহার উপলব্ধি হইবে।

"যে পথে অনন্তলোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তের
শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উর্দ্ধে লয়ে যাও
পঙ্ক কুণ্ড হতে
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে"।

যুগ-যুগান্তের বিরাট স্বরূপই বা কি? অনন্ত লোকের গোপন চলার পথটাই বা কি? মহান মৃত্যুর মুখোমুখী হইবার কামনাই বা কোন?

আর শেলির কবিতার বক্তব্য বিষয় কি? আমার কথাগুলি মানব সমাজে ছড়াইয়া পড়ুক যাহাতে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য (Millenium) সৃষ্টি হয়। হইবেনা যে তাহাও বলা যায় না, কারণ শীতের পরে বসন্তের আসা-ই নিয়ম। শেলির কবিতা পশ্চিমের সমালোচকেরা কি বলিতেছেন? Herford বলিতেছেন এই কবিতায় আছে (১) highest degree of imaginative quality কল্পনার চরম মাহাত্ম্য বা চাতুর্য (২) তৎসহ অন্যান্য কবিতার মত ব্যক্তিগত নৈরাশ্য Personal despondency এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার উন্মাদনা Prophetic passion, (৩) মানবজাতির দুঃখ বোধ।

অতএব এই কবিতার বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে "বর্ষশেষের" কোন মিলি ত নাই, বরং বৈশাদৃশ্য আছে।

শেলি ঝড়ের বর্ণনা দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সমাপ্তির অর্থাৎ প্রাচীণের মৃত্যুর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে বসিয়াছেন।

শেলি চান তাঁহার পৃথিবীকে সুন্দরতর করিবার বাণীগুলি, মানব সমাজে ছড়াইয়া পড়ুক।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় কোন মানব হিতৈষণার নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই তিনি চান অনন্তের অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে। মৃত্যু যে মৃত্যু নহে, ইহা যে অনন্ত জীবন স্রোতের তরঙ্গ মালার রূপ পরিবর্তন মাত্র, বাহিরের এই পরিবর্তন অন্তরের নিত্যসত্তার যে কোন পরিবর্তন আনিতেছেনা সেই সত্যকে বুঝিয়া লইতে। একজনের মধ্যে অদ্বৈতবাদের দার্শনিকতার ইঙ্গিত, আর একজনের কাব্যে রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি কামনার আভাস।

শেলি দুঃখে মরিয়া যাইতেছেন

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু চাহিতেছেন অনন্ত জীবনকে পাইবার জন্য।

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন—"এই কবিতায় প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ প্রাণের স্পন্দন নাই, ইহা একেবারে বর্হিজগতের সাধারণ বর্ণনা।

"তোমারে প্রনমি আমি হে ভীষণ সুস্নিগ্ধ শ্যামল
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চি রেখা .
করজোড়ে চেয়ে আছি উর্দ্ধমুখে পড়িতে জানিনা
কি তাহাতে লেখা
হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুতে দাও টান
ঝনন রণন

বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন
হে কিশোর তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ
* * * *
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি
ছিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি"
কিংবা,—"রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম নাহি বুঝিলাম
জয় তব জয়।"
কিংবা—"বীণা তন্ত্রে হানো হানো খরতর
ঝংকার ঝঞ্জনা
তোলো উচ্চসুর
হৃদয় নির্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
মুক্ত করি দিনু দ্বার আকাশের যত বৃষ্টি ঝড়
আয় মোর বুকে
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।
বিজয় গর্জন স্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গল নির্ঘোষ
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ।

সে পূর্ণ উদাত্ত বেদগাথা সামমন্ত্রসম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্তে অখণ্ড মূর্তি ধরি
হউক বাহির।
নাহি তাহে দুঃখ সুখ, পুরাতন তাপ পরিতাপ
কম্প লজ্জা ভয়—
শুধু তাহা সদ্যস্নাত ঋজুশুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়॥"

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলি কোন্ বহির্জগতের বর্ণনা; আর কত প্রাণের স্পন্দন অধ্যাপক মহাশয় লাভ করিতে চাহেন? এইখানে প্রাণের স্পন্দন নাই, আছে শেলির মেঘের সঙ্গে চুলের তুলনায়? সাগরের গাছপালা ঝড়ের তাড়নায় যে নাচিয়া উঠে কেবল সেই কয়টি কথার মধ্যে? এইখানে কি শুধু শব্দ ও অলঙ্কারের আতিশয্যেই চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছে?

"শেষের দিকে কবি নূতনকে আহ্বান করিয়াছেন; কাব্য হিসাবে এই অংশ আরও নিকৃষ্ট। কবি জানেন না যে নূতন কি বিশিষ্ট বাণী আনিবে এবং তাহার সঙ্গে ঝড়ের কি সম্বন্ধ তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তাঁহার এই অস্পষ্ট ধারণাকে কবি অনুপ্রাস ও অন্য অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছেন যদিও ছন্দের ঝঙ্কারে ভাবের দৈন্য ঢাকা পড়ে নাই।" অর্থাৎ অধ্যাপক মহাশয়ের নির্দেশমত আমাদের বুঝিতে হইবে উদ্ধৃত বাক্যাংশগুলি কাব্য হিসাবে নিকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট কাব্যের কয়েকটি নমুনা ইংরেজী সাহিত্য হইতে বাছিয়া অধ্যাপক মহাশয় আমাদের চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলে বাধিত হইতাম। কেবল শেলির মত কতকগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকাই উৎকৃষ্ট কাব্য, আর সেই প্রকৃতির আকস্মিক আলোড়ন বেদগাথা সামমন্ত্রসম সরল গম্ভীর উদাত্তধ্বনি কবির সমগ্র চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া যে এক সদ্যস্নাত ঋজু গম্ভীর মুক্তজীবনের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতেছে, মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততায় যে অখণ্ডজীবনের খরস্রোত আন্দোলিয়া যাইতেছে

এবং সেই অখণ্ড সত্যের সঙ্গে, সেই বিরাটের সঙ্গে একাত্মভূত হইবার জন্য কবি যে মাটির দেহকে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে চাহিতেছেন—সেই উন্মত্ত উদ্বেল পিপাসার সঙ্গীত, একেবারে নিকৃষ্ট? ভাবের দৈন্যের তাহা নমুনা, কেবল শব্দের ঝঙ্কার, প্রাণের ঝঙ্কার কোথাও নাই?

"শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে
ঊর্দ্ধে লয়ে যাও পঙ্ককুণ্ড হতে
মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে"

"তারপরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো যাহা ইচ্ছা তব
ভগ্ন করো পাখা
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল
ছিন্ন ভিন্ন শাখা।
ক্ষণিক খেলনা তব দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ -
সেথা মোরে ফেলে দিও অনন্ত তমিস্র সেই
বিস্মৃতর দেশ।"

অধ্যাপক মহাশয়ের মতে আমাদের বুঝিতে হইবে এইখানে প্রাণের উন্মাদনা নাই। এইখানে কেবল অনুপ্রাস ও অলঙ্কার, ভাবের দৈন্য। নূতন কি বিশিষ্ট বাণী আনিবে তাহা এখানে স্পষ্ট হয় নাই।

অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট নূতনের বাণী স্পষ্ট হয় নাই। কারণ শেলি কীট্‌সের কাব্যে তিনি এই আধ্যাত্মিকতার কোন আভাস পান নাই, কোন ইংরেজ সমালোচকও তাহা লইয়া আলাপ করেন নাই। আম্রফলের মধ্যে কেহ যদি কাঁটালের স্বাদগন্ধ না পাইয়া হতাশ হন, সে দোষ যে আম্রফলের নহে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যুগযুগান্তের যে একটা বিরাট স্বরূপ রহিয়াছে এবং তাহা

যে নিত্য পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তনীয়, ঝড়ের মৃত্যুতাণ্ডবের মধ্যে সেই স্থির অচঞ্চল সত্য যে চির নূতন, তার যে ক্ষয় নাই, ধ্বংশ নাই, মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জ্বলদর্চিরেখা বহিঃপ্রকৃতির আবরণকে বিদীর্ণ করিয়া কবিকে যে সেই লোকের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে একেবারে ডুব দিবার জন্য কবির সমগ্র সত্তা যে উন্মাদ হইয়াছে—এই সকলের মধ্যেও নূতন কি বিশিষ্ট বাণী আনিয়াছে তাহা স্পষ্ট হয় নাই এবং ঝড়ের সঙ্গে এই নূতনের সম্পর্ক কি তাহাও ধরা পড়ে নাই—এইরূপ সমালোচনার মর্ম বুঝা ভার।

[আমার এই পরিচ্ছেদের পাঠকদের অনুরোধ করিব এই গ্রন্থের "রবীন্দ্র সাহিত্যে নিসর্গ" নামক পরিচ্ছেদে এই কবিতা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা একবার পাঠ করিতে]

মানুষ অন্তরের সত্যকে ক্রমশঃ চিনিতেছে, পুরাতন জ্ঞান নূতন বৃহত্তর জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইতেছে। এইভাবে পরিবর্তনের স্রোত বাহিয়া মানুষের নিকট সত্য উন্মেষিত হইতেছে। সত্যকে নিত্য আমরা অন্তরের মধ্যে গড়িতেছি। আজকের অল্পজ্ঞানে জানিতেছি আমি 'ইহা', কাল জানিতেছি আমি 'উহা' অবশেষে জানিতেছি আমি 'ইহা' বটে 'উহা'ও বটে, তদতিরিক্তও বটে। এইরূপে আমি যে 'ভূমা' তাহা উগলব্ধি করিয়া সারা বিশ্বে আমার 'আমি'কে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি। কাল-বৈশাখীর ঝড় পুরাতন সত্যের ধ্বংস ও নূতন সত্যের উন্মেষের এই ইঙ্গিতই বাহিয়া আনিল! ঝড়ের তাণ্ডব নর্তন তাঁহার অন্তর্লোকে তাঁহার ব্যক্তিসত্তার এই ভাঙ্গাগড়ার বাণীর ঝঙ্কার তুলিল। সৃষ্টির জন্য যে প্রলয় এবং প্রলয়ের জন্যই যে সৃষ্টি এই সত্যেরই ইঙ্গিতময়তা কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে! তাই কবি বলিতেছেন—

"যে পথে অনন্তলোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ প্রান্তের

এক পার্শ্বে রাখো মোরে নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।"

যুগযুগান্তের বিরাট স্বরূপকে মানুষের প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। অল্প জানিয়া ত সুখ নাই! আত্মানং বিদ্ধি সেই বিরাট আত্মা, যিনি

"উর্দ্ধপূর্ণং অধঃপূর্ণ মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্
সর্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্তস্য লক্ষণম্"

শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি হইতে উত্থিত হইয়া, রুদ্ধঘরের স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালির আবহ হইতে বাহির হইয়া আমার এই পূর্ণকে আমি উপলব্ধি করিব। হে কাল বৈশাখী! তুমি আমার অভ্যস্ত জীবনকে ধ্বংশ করিয়া এই সুমহান পথে আমাকে লইয়া চল।

ইহাই 'বর্ষশেষের' বাণী এবং ইহা কবিতায় যতটা স্পষ্ট হইয়াছে তদতিরিক্ত প্রয়োজন ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' নামক উপন্যাসটির কথা আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে আলোচনা করিরাছি। ইংরেজ মণীষী বার্ণাড শ'র Man and Super Man নামক নাটকের আখ্যানভাগের সঙ্গে ইহার খানিকটা সাদৃশ্য অনুমান করিয়া কোনো সমালোচক ইহাকে ঐ ইংরাজী নাটকের বাঙ্গালা সংস্করণ বলিয়াছেন। ইহাও একটি ভ্রান্ত ধারণা। Man and Super Man নাটকের বক্তব্য বিষয় এই যে নারী প্রজাসৃষ্টির যন্ত্র। প্রকৃতি তাহাকে দিয়া সন্তান সৃষ্টির কৌশল ফাঁদিয়াছেন। সেই কারণে নারীর মধ্যে সর্বদা সৃষ্টি প্রেরণা, শ'র ভাষায় Life Force কাজ করিতেছে। কোনো নারী এই Life Forceএর প্রেরণা এড়াইতে পারে না। তাই নারী সর্ব্বদা প্রজাসৃষ্টির উপযুক্ত স্বামীকে বাছিয়া লয়েন। Man and Super Manএর 'এনি নামক নায়িকা অক্টেভিয়াস নামক সর্ব্বজনপূজ্য ভাবুকচিত্ত কবিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সর্ব্বজন-নিন্দিত টেনার নামক এক মুগ্ধ ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করিল।

কারণ প্রজা সৃষ্টির প্রয়োজনে একজন দুর্ব্বল দেহী কবি অপেক্ষা স্থূলবুদ্ধি কামার্ত একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ঢের বেশী উপযুক্ত। 'শেষের কবিতা' নামক উপন্যাসে লাবণ্য নাম্নী একটি নারী ভাবুকচিত্ত অমিতকে বিবাহ না করিয়া কবিত্ব বর্জ্জিত সাধারণ সংসারী মানুষ শোভনলালকে স্বামীত্বে বরণ করিল। বস্তুত আখ্যান ভাগের এই সাদৃশ্য 'এহ বাহ্য'। দুইটি গ্রন্থের মর্ম্মকথা একেবারে বিপরীত। শ' দেখাইতেছেন সৃষ্টি প্রেরণাতেই 'এনি' অক্টেভিয়াসকে ছাড়িয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসে বলিতেছেন লাবণ্য অমিতর দেহসীমার বাহিরে চলিয়া গেল অমিতর বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয় প্রেমকে উপলব্ধি করিবে বলিয়া! প্রত্যহের ম্লান. স্পর্শ লাগিয়া সেই প্রেম কলুষিত হইতে পারিত। লাবণ্যর মধ্যে দেহতৃষ্ণাকে কোথাও তিনি বড় করিয়া দেখান নাই এবং শোভনলালকেও মার্জ্জিত রুচির একজন শিক্ষিত যুবকরূপেই তিনি চিত্রিত করিয়াছেন। টেনারের মত কামনার পিণ্ডরূপে চিত্রিত করেন নাই। শ' বস্তুবাদী, রবীন্দ্রনাথ আত্মবাদী। অতএব এই দুই জনের লেখার মিল হইতে পারেই না। শ'র মতে নারী কামনার পিণ্ড, প্রকৃতির Life Force এর যন্ত্রমাত্র রবীন্দ্রনাথের মতে কামনার দ্বারা নারীর সত্য উপলব্ধি সম্ভবই হয় না।

এই গ্রন্থের অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলিতেও রবীন্দ্র সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসাহিত্যের তুলনামূলক কিছু কিছু আলোচনা স্থান পাইয়াছে, অতএব এই আলোচনা এইখানেই শেষ করিলাম।

কবির স্বদেশ প্রেম

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেমের একটি আধ্যাত্মিক ভূমিকা রহিয়াছে। স্বদেশ প্রেমিক কবি স্বদেশের গুণগান করিবেন, মাতৃভূমি ঋদ্ধিযুক্ত হইলে Rule Britania Rule the Waves লিখিবেন, না হইলেও সপ্ত দ্বীপা বসুন্ধরার মধ্যে তাঁহার স্বদেশই যে স্বর্গভূমি এবং সেই স্বর্গ ভূমির ভাগ্যবান অধীবাসীরাই যে পরমেশ্বরের নির্বাচিত সন্তান, সম্ভব অসম্ভব সকল রকমের যুক্তি দিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক।

পরশাসন লাঞ্ছিত ভারতের দুর্দশার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, দেশবাসীর হৃদয়ে দেশ প্রেমের তীব্র শিখা জ্বালাইয়াছিলেন, শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকের দলিত আশা আকাঙ্খাকে অগ্নিলেখায় দেশবাসীর অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন—সবই সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকল আপেক্ষিক প্রয়োজনের উর্দ্ধে এক বিশ্বাত্মবুদ্ধির সুমহান আদর্শের দিকেও তিনি তাঁহার দেশবাসীর কামনাকে উৎসারিত করিয়াছিলেন। ভারতের আকাশের মতই এই আদর্শ স্বচ্ছ মুক্ত ও অনন্ত অবগাহী, ভারতের হিমালয়ের মতই ইহা নিম্নের বিপুল বসুধার মানবতাকে উর্দ্ধের অমৃত লোকের সঙ্গে সংযুক্ত করিবার তপস্যাকে জাগ্রত রাখে।

গীতাতে আছে যিনি মহান হইতে সুমহান, তাঁহার স্বদেশ কোন বিশিষ্ট ভুভাগ নহে, সমগ্র বসুধাই তাঁহার মাতৃভূমি। আপনাকে তিনি নিখিলের সর্বভূতে দেখিতে পান, নিখিল বিশ্বকে আপনার মধ্যে নিবেশিত দেখেন।

"সর্বভূতস্থ মাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতেতু যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।"

ভারতের অন্যান্য আপ্তবানীর ন্যায় এই বাণী নিভৃত অরণ্যানীর নির্বিঘ্ন প্রশান্তির মধ্যে বিরচিত হয় নাই।

বিস্তীর্ণ সমর ক্ষেত্র, সম্মুখে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী শত্রুসৈন্য। অন্তরীক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পাঞ্চজন্য বাজিয়াছে, বল্গাবদ্ধ অশ্ব রণোন্মাদনায় ঘন ঘন ক্ষুরাঘাত করিয়া মেদিনীর ধুলি উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিতেছে। সদ্যোত্থিত সূর্য সদ্য প্রজ্বলিত প্রতিহিংসার ন্যায় সম্মুখ গগনে জ্বলিতেছে। কেবল একটি মুহূর্তের অপেক্ষা। কিন্তু কোথায় বজ্রবিদ্যুৎ, কোথায় পাশুপত অস্ত্রের প্রলয় নির্ঘোষ?

কুরুক্ষেত্রের বজ্রগর্ভ, বিদ্যুৎবিদীর্ণ আকাশ ঠিক এই মুহূর্তে প্রলয়াগ্নির পরিবর্তে অকস্মাৎ স্বর্গের করুণাঘন পারিজাত বর্ষণ করিতে লাগিল।

তৃতীয় পাণ্ডব-করধৃত গাণ্ডীব পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। শত্রু বধ করিয়া তাঁহার প্রয়োজন নাই, শত্রুদের রাজ্যদান করিয়া তিনি চীরধারী হইয়া অরণ্যে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

ভারতের ইতিহাস নাই। গ্রীস, রোম, মিশর, বেবিলোনের আছে। সেই সকল দেশের যত্ন রক্ষিত ইতিহাসের সংখ্যাতীত পৃষ্ঠা হইতে এমন একটি পৃষ্ঠা কেহ আবিষ্কার করিয়া দিতে পারিবেন না। ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর্যের এই পরিনাম। যাহা হোক, পার্থসারথীকে যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিক্রমার সঙ্কল্প আপাততঃ পরিহার করিয়া মহামানবতার মানসলোক পরিক্রমার উদ্যোগ করিতে হইল। পার্থকে পুনরায় গাণ্ডীব স্পর্শ করাইতে সারথীকে অনাদি কালের ভাবগর্ভ উন্মুক্ত করিতে হইল। অর্জ্জুন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন, সৃষ্টি কি, স্রষ্টা কে, নিষ্কাম কর্মের পরিণাম কি, আপন পর কে বা কাহারা। দেখিলেন সেই অনন্ত ভাব-সমুদ্র, যেখানে শত্রুমিত্র, আপন-পর, দূর-নিকট পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ভাসিতেছে। বিশ্বমৈত্রীর সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া বিশ্বাত্মায় আপনাকে শায়িত করিয়া যিনি "শিব" আখ্যা লাভ

করেন নাই তিনি জন্ম জন্মান্তর চেষ্টা করিয়াও এই মৈত্রীর, এই বিশ্ববোধের সন্ধান পাইবেন না।

কেবল কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে নয়, কলিঙ্গের প্রান্তরে, রাজপুতনার মরুক্ষেত্রে, পাণিপথে কতবার ভারতের বীর্য এই ভাবে অকস্মাৎ গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে কে? বেশীদিনের কথা নয় ১৯২২, শালের চৌরি চোরাতেও অবিকল এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়া গেল। আমরা বিস্মিত হইলাম। কিন্তু ভারতের ভাগ্য বিধাতা বিস্মিত হন নাই। হে ভারত। ওগো জননী! "কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।"

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন এই ত ভারতবর্ষ! এই ত আমার স্বদেশ, এই ত মহামানবের তীর্থ ক্ষেত্র! ইহা কবিকল্পনার উচ্ছ্বাস নহে, ভারতের আকাশ মাটির ইহাই সত্য বাণী। এই বাণীর পরিণামের কথা কল্পনা করিয়া আমরা শঙ্কিত হই। কিন্তু অনন্ত কাল দর্শী কবি-মানস বিচলিত হয় না।

"আজ নব বর্ষের শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর একটি ভাব আমরা হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তাহা ভারতবর্ষের একাকিত্ব। এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ, পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। সকল দেশেই একজন অচেনা বিদেশী পথিক অপূর্ব দেশভূষায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্থানীয় লোকের কৌতূহল যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে—তাহাকে ঘিরিয়া, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, আঘাত করিয়া, সন্দেহ করিয়া বিব্রত করিয়া তোলে। ভারতবাসী অতি সহজে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে—তাহার দ্বারা আহত হয়না এবং তাহাকে আঘাত করেনা। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান হিয়োনথ সাং যেমন অনায়াসে আত্মীয়ের ন্যায় ভারত পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন য়ুরোপে কখন ও সেরূপ

পারিতেন না। ধর্মের ঐক্য বাহিরে পরিদৃশ্যমান নহে, যেখানে ভাষা, আকৃতি, বেশভূষা সমস্তই স্বতন্ত্র, সেখানে কৌতূহলের নিষ্ঠুর আক্রমণকে পদে পদে অতিক্রম করিয়া চলা অসাধ্য। কিন্তু ভারতবর্ষীয় একাকী আত্মসমাহিত সে নিজের চারিদিকে একটি চিরস্থায়ী নির্জনতা বহন করিয়া চলে—সেইজন্য কেহ তাহার একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়ে না। অপরিচিত বিদেশী তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইবার যথেষ্ট স্থান পায়। যাহারা সর্বদাই ভিড় করিয়া, দল বাঁধিয়া, রাস্তা জুড়িয়া বসিয়া থাকে, তাহাদিগকে আঘাত না করিয়া এবং তাহাদের কাছ হইতে আঘাত না পাইয়া নূতন লোকের চলিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তবে এক পা অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় যেখানে থাকে সেখানে কোনও বাধা রচনা করেনা—তাহার স্থানের টানাটানি নাই—তাহার একাকিত্বের অবকাশ কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। গ্রীক হইক, আরব হউক, চৈন হউক, সে জঙ্গলের ন্যায় কাহাকেও আটক করেনা, বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়—আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোন কথা বলে না।

(স্বদেশ-নববর্ষ)

অতএব ভারতের জাতীয় কবি যে প্রচলিত জাতীয়তার গান গাহিবেন না তাহা চিরসিদ্ধ সত্যের মতই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রের মনোভূমিতে যিনিই দৃষ্টিপাত করিবেন তিনিই এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবেন যে ঐ মানসভূমির ভাবতরুগুলির মূল রহিয়াছে একেবারে শত শতাব্দীর অতীত যুগের নীবার ধান্য ক্ষেত্রের সন্নিহিত অরণ্যভূমির গর্ভে। শত শতাব্দীর বিস্তীর্ণ আকাশ পার হইয়া তাহাদের শাখাগুলি এই যুগের কবির মনোভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে—কবি তাহাদের ফুল ফল অকাতরে আমাদের দান করিলেন।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের আলেখ্য। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের মাধ্যমে এই ফলের রস, এই ফুলের গন্ধ বহুকাল আমরা লাভ করি নাই। বহুদিন পরে কবি আপনার হৃদয় নিকুঞ্জ হইতে এই অনর্পিত ধন আহরণ করিয়া ধরণীর অঞ্চল ভরাইয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে গোড়াতে এই কথাটি স্মরণে রাখিতে হইবে। সাময়িক সমস্যার কথা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যখনই চিরকালের ভারতের কথা বলিতে গিয়াছেন তখনই তাঁহার জাতীয় কবিতা বিশ্বমৈত্রীর কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে এবং তাহার কারণ রহিয়াছে ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্যের মধ্যে। স্ববিরুদ্ধ উক্তির মত মনে হইবে, কিন্তু যিনিই ভারতবাসীকে চিনিয়াছেন তিনিই জানেন একদিকে ভারতবাসী পৃথিবীতে বড় একা, অন্যদিকে তাহার স্বদেশ বলিতে কিছুই নাই। সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা তাহার স্বদেশ। তপঃজ্যোতিদীপ্ত বিজ্ঞানের আলোকে ভারতবর্ষ দেখিয়াছিল বিশ্বের প্রতি অণুতে এক ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন। তাই বিশ্ব-বোধকেই ভারতবর্ষ মানবত্মার চরম ও পরম পরিণতি বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছে। "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য" প্রত্যেকের মধ্যে তাঁকে (পরমেশ্বর) চিন্তা করে, তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বলো, সমাজেই বলো, রাষ্ট্রেই বলো, যে পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই। যে পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই বিনাশ।............বিধাতা এই ভারতবর্ষের সমস্যাকে সব চেয়ে ঘণীভূত করে তুলেছেন, সেই জন্যে আমাদেরই এই সমস্যাটির আসল উত্তরটি দিতে হবে—এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি।

"যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যে বানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে",

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকে ঘৃণা করেন না।

…………আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক কোরে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে, কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠ্‌বে। যিনি সর্বগতঃ, শিবঃ, যিনি সর্ব-ভূতগুহাশয়ঃ, যিনি সর্বানুভূঃ। তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে, যদি বলো এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তা হোলে আমি বল্‌ব স্বজাতি অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয়, এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত আছে। সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বল্‌তে হবে 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌'। প্রবলরা দুর্ব্বল ব'লে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র ব'লে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে।

(শান্তিনিকেতন)

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।"

* * *

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা, নাহি কোন ডর
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

(গীতাঞ্জলি)

এই সত্যের আবিষ্কার একদা ভারতবর্ষকে বিশ্বমানবের তীর্থভূমি বানাইয়াছিল, সেই ভবিষ্যৎ নিশ্চয় আসিবে যে ভবিষ্যতে আমরা প্রত্যক্ষ করিব সেই অতীতকে সেই বিশ্বমৈত্রীর, বিশ্বপ্রেমের রাজ্যকে। যিনি ভারতের যথার্থ জাতীয় কবি, তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন ছাড়া অন্য স্বপ্ন দেখিতে পারেন না, তিনি মহামানবের কথা ছাড়া কাব্যের নামে গোষ্ঠিবাদিতার, সঙ্কীর্ণ স্বাজাত্যদম্ভের বিষোদগার করিতে পারেন না।

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগোরে ধীরে—
এই ভারতের মহা মানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে
নমি নর দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে"

(গীতাঞ্জলি)

সমগ্র ধরিত্রীর মানবতাকে যদি এক ঠাঁই দেখিতে চাও, তবে দেখ এই ভারতবর্ষকে। বিশ্বমানবের মধ্যে সেই সর্বানুভূকে নিরীক্ষণ করিয়া, "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য," ভারত যে সমগ্র ধরিত্রীকে যুগে যুগে কালে কালে আপনার প্রেমের রাজ্যে ডাকিয়া আনিয়াছে।

"হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে।

* * * *

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শকহুনদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"

ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবতা; খৃষ্ট, মহম্মদ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বরং ইঁহাদের শিষ্যরা ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাসকে পরিহাস করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু ভারতের মনীষা, ভারতের ধর্মবোধ ইঁহাদের উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য পূজা নিবেদন করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। এই সেদিন দক্ষিণেশ্বরের ঋষি আমাদের শিখাইয়া গেলেন চৈতন্য, বুদ্ধ কৃষ্ণ রামচন্দ্রের মত খৃষ্টও যথার্থ অবতার, মহম্মদ পরমেশ্বরের যথার্থ প্রেরিত পুরুষ। অতএব কবি রবীন্দ্রনাথের অনুভব ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির তপস্যালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত। এই কাব্যকে কবির অতিশয়োক্তি বলিয়া যিনি মনে করিবেন তিনি ভারতবর্ষকে জানেন না। ভারতের জাতীয়তার স্বরূপ তিনি অবগত নহেন। মনে রাখিতে হইবে ইহাই ভারতের একমাত্র মর্মবাণী, যেদিন ভারত এই বাণী ভুলিবে সেদিন ভূপৃষ্ঠে এই ভূখণ্ডের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

মনীষার পূজা, জ্ঞানের পূজা, ভারতবাসীর মজ্জাগত। যেখানে জ্ঞান সেইখানেই ভগবান, যেখানে আলোক সেইখানেই ঐশী শক্তির বিকাশ, তাই ভারতীয় ঋষিরা নিরীশ্বর চার্বাককেও ঋষি আখ্যা দিয়াছেন, ঋষি মাত্রকেই ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তথাকথিত খৃষ্টজগতের সঙ্গে, মুসলমান জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইখানেই ব্যবধান। খৃষ্টান পুরোহিত সম্প্রদায়, একদা বিজ্ঞানের (দর্শনের) চর্চাকে এমন অপরাধের বলিয়া গণ্য করিতেন যে গ্রীক বা অন্য দর্শনের কোন গ্রন্থ কোন খৃষ্টানের হাতে দেখিলে তাহাকে অগ্নিতে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করিতেন। অহিংস খৃষ্টান ধর্মের এই পরিণাম! খৃষ্টান পৌরহিত্যের সেই কালিমাময় পৃষ্ঠাগুলি যিনিই পাঠ করিবেন হৃদয় তাঁহার শোকে দগ্ধ হইবে। কোরাণ অতিরিক্ত কোন গ্রন্থ পাঠ করা এক শ্রেণীর মুসলমান অনৈস্লামিক মনোবৃত্তি বলিয়া সদম্ভে প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারত একদিকে যেমন আপনার জ্ঞান বিজ্ঞান বিশ্বজনকে দান করিয়াছে, অন্যদিকে অপরের প্রজ্ঞাকে সভক্তি প্রণতি জানাইয়াছে। এইখানেই ভারতীয়

প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। শতাব্দীর উত্থান-পতন, প্রলয়-অভ্যুদয়ের মধ্যেও ভারতের আত্মা এই প্রজ্ঞা-পিপাসাকে পরিহার করে নাই।

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে।"

ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবতা, একদা ভারতের মনুষ্য-সংখ্যাও তেত্রিশ কোটিই ছিল। কিন্তু এই তেত্রিশ কোটি মানুষ, আর তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ভারত দেখিয়াছিল কেবল একজনকে। "ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট্ ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্ত চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে—"পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও"

তিনি কহিবেন—"ওঁ ইতি ব্রহ্ম"।

তিনি কহিবেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি

তিনি কহিবেন—আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"

(স্বদেশ)

"তপস্যা বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞ শালার খোলা আজি দ্বার
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"

"পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। একেকে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একেকে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধাবিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"

(স্বদেশ—ভারতবর্ষের ইতিহাস)

"বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠা দ্রঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে..........."

(স্বদেশ—নববর্ষ)

"সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
দুঃখের রক্ত শিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এদুখ বহন করো মোর মন,
শোনোরে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়
অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ!
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে।"

সুদূর হইতে ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন কল্পনা করিয়া যে ভারত ভেদ-বুদ্ধিকে অবিদ্যা বলিয়া জানিয়া ঐক্যবোধকে সাধনার একমাত্র লক্ষ্য নিরূপণ করিয়াছিল, সে ভারত আজ শতধা-বিচ্ছিন্ন, অন্তরে এবং বাহিরে। কিন্তু 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্', ভারতের এই অন্ধকার রাত্রি একদা সেই প্রেম ও প্রজ্ঞার প্রভাতের মধ্যে নিশ্চয় অবসিত হইবে। এই ধ্যানের ভারতকে স্মরণ করিয়া কবি যখনই বর্তমানের পারি-পার্শ্বিকতার দিকে তাকাইয়াছেন তখনই মর্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিয়াছেন।

"তোমা হ'তে দূরে যত গেছি স'রে
তোমাকে দেখেছি তত ছোট ক'রে
কাছে দেখি আজ হে হৃদয় রাজ
তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস তব পর্ণকুটির কল্যাণে সুপবিত্র,
তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থি মজ্জা
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে দিয়েছি
পেয়েছি লজ্জা

আর্থিক দৈন্য, স্বাস্থ্যের দৈন্য, কোন দৈন্যই ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি নয়, যত বড় ক্ষতি ভারতের আত্মবিস্মৃতি। কবি বলিয়াছেন ভারতবর্ষকে যদি বাঁচিতে হয় তবে তার প্রাচীন আদর্শের মধ্যেই বাঁচিতে হইবে, ভারতের প্রাচীনই চির নবীন। ভারতকে শুনিতে হইবে সেই পিতামহ ভারতের সাধনালব্ধ ব্রহ্মের বাণী। হে ঈশ্বর তুমি তাহাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ এইবার বজ্রের আঘাতে তাহাকে তোমার নামে জাগ্রত কর

"ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বি পরে
ধূলি বিলুণ্ঠীত সুপ্তি ভরে
রুদ্র তোমার নিদারুণ বজ্রে
করো তারে সহসা তর্জিত হে,

পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে হইবে পুলকে সজ্জিত হে।”

ভারতের জাতীয় কবির স্বদেশ সাধনা ব্রহ্মসাধনার অঙ্গবিশেষ, কারণ সবারে জড়ায়ে সবার মাঝে সেই একজনই যে বিরাজ করিতেছেন এই উপলব্ধির তাঁহার স্বদেশ হিতৈষণার মর্মকথা। এই সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা লইয়াই কবি স্বদেশের পানে তাকাইয়াছেন, স্বদেশের সেবার কথা ভাবিয়াছেন। তাই একদিকে যেমন তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন

“এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,……”

(চিত্রা —এবার ফিরাও মোরে)

অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন

তারপরে দীর্ঘ পথ শেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্ত পদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহারা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে……”

এই “নিকেতন” কি? কে এই আশ্রয়?

“জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে

* * *

শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভিক পরাণে
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন
……………… শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।…” (এবার ফিরাও মোরে)

স্বদেশসেবার সঙ্কল্পের মধ্যে হঠাৎ ঈশ্বর উপাসনার সঙ্কল্পের সংমিশ্রণ দেখিয়া রবীন্দ্র সাহিত্যের অনেক পাঠকই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান এইরূপ সংমিশ্রণ একমাত্র ভারতীয় জাতীয় কবির কাব্যেই সম্ভব। ভারতীয় কবির হাতেই ঐতিহাসিক শা-জাহান বিশ্বমানবতার, পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতিভূ হইয়া পড়েন। ইহাতে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয় কিন্তু মানবতার ঐতিহ্যের দর্শন মিলে। অন্য কোন দেশের জাতীয় কবির কাব্যে এইরূপ কল্পনা দেখা যায় নাই বলিয়া এই কাব্যকে জাতীয় কাব্য নহে বলা ভারতকে তথা রবীন্দ্রমানসকে না চিনিবার লক্ষণ।

ভারতের ভেদবুদ্ধির কথা, অস্পৃশ্যতার কথা অনেকেই বলিয়াছেন। কিন্তু একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন বিবেকানন্দ কিংবা মহাত্মাজীর বলার সঙ্গে পলিটিশিয়নদের বলার ব্যবধান এইখানে যে ইঁহারা কোন রকমে বিদেশীর হাত হইতে রাজ্য উদ্ধারের উপায় হিসাবেই অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করেন নাই। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্যই অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে হইবে, এই মনোভাবের মধ্যে ভালবাসা নাই, সত্যোপলব্ধি নাই, আছে প্রচ্ছন্ন ঘৃণা, স্বার্থপরতা "আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে সেই উপায়ে আমি প্রবল হব,.........কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি সর্বগতঃ শিবঃ, যিনি সর্বভূতগুহাশয়ঃ, যিনি সর্বানুভূঃ।"

"শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও করনা নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধুলার তলে হীন—পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।"

(গীতাঞ্জলি)

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।" (গীতাঞ্জলি)

"আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষা কালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্মের বাসনা, জনসঙ্ঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে "ফ্রীডম্" বলে, সে-মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু, তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর, তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করেনা এবং সত্যকে ও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এই জন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্মে-চর্মে, অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে—তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে—তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় "ফ্রীডম্" কোন কালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না—কারণ আমাদের জনসাধারণ অন্য সকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীনতর ছিল। এখনো আধুনিক কালের ধিক্কার সত্ত্বেও এই "ফ্রীডম্" আমাদের সর্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল—এই 'ফ্রিডমে'র চেয়ে উন্নততর—বিশালতর যে মহত্ত্ব—যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি—অন্তরের মধ্যে আমরা

লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো-বড়ো রাজমুকুট পবিত্র হ'বে।" (স্বদেশ—নববর্ষ)

এই ভারতবর্ষেরই ছবি আঁকিয়াছেন কবি তাঁহার নৈবেদ্যের "জনারণ্য" কবিতায় "…চৌদিকে আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি॥
তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহাজনারণ্য-মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসন যোগি, কোলাহল মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে সব চিন্তা সব চেষ্টা পরে
যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা,
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা।"

(নৈবেদ্য—জনারণ্য)

আমরা এখন Secular State এ বিশ্বাসী। অর্থাৎ ধর্মকে আমরা রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে চাই। কিন্তু বর্তমান য়ুরোপে ধর্ম একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে, বাকী যাহা আছে তাহা ঐ দেশের অধিবাসীদের দশ আসবাব আভারণের একটির মত। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক য়ুরোপের এই অদ্ভুত মনোভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"য়ুরোপের "রিলিজন্" বলিয়া যে শব্দ আছে, ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব—কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে—আমাদের বুদ্ধি-বিশ্বাস আচরণ, আমাদের ইহকাল পরকাল, সমস্ত জড়াইয়া ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনটাকে পোষাকী এবং কোনটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়, বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের

ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম—তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে—তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক ভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে"

(স্বদেশ—ভারতবর্ষের ইতিহাস)

তাই ভবিষ্যৎ ভারতরাষ্ট্রের কথা যখনই কবি ভাবিয়াছেন তখনই তাঁহার মানসনয়নে ভাসিয়াছে সেই রাজ্য—

"নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত"

(নৈবেদ্য)

"রে মৃত ভারত
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ" (নৈবেদ্য)

য়ুরোপ আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মেই বিশ্বাস করে এবং আধুনিক ইউরোপ সেই আনুষ্ঠানিক ধর্মকে রবিবারের গীর্জ্জায় দ্বীপান্তর দিয়া একরকম নিশ্চিন্তই ছিল, কিন্তু য়ুরোপের একটি বৃহৎ অংশ আজ চরমপন্থী। এই অংশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়, একেবারে ধর্মবর্জিত রাষ্ট্র গঠনে তৎপর। 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' এই রাষ্ট্রের বিভীষিকা বর্ত্তমান য়ুরোপে কী ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে কোন দিনের দৈনিক কাগজের উপর চোখ বুলাইলেই তাহা ধরা পড়ে। আজ কেহ নিখোঁজ, কাল কেহ রাষ্ট্রভবনের সপ্ততলের বাতায়ন হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া একেবারে মৃত্যুর গহ্বরে গিয়া স্বদেশের রাষ্ট্রের করুণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লইতেছেন। কেহ বা দেশান্তরে আশ্রয় লইয়াও একদা নিজহাতে গড়া নাস্তিক রাষ্ট্রের হাতুড়ীর আঘাতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে ভবলীলা সংবরণ করিতেছে। এই ভাবে য়ুরোপ আজ স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছে। কিন্তু য়ুরোপের ধনকৌলীন্য, আসুরিক শক্তি, স্থল জল অন্তরীক্ষে বিজয়

অভিমান, য়ুরোপের কানা ফসেট্‌কে ও মূল্য দিয়াছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের ত কথাই নাই ঐ দেশের একখানা প্রচার পেম্ফলেট পর্য্যন্ত য়ুরোপের বাইরে বেদ বাইবেলের ও বেশী মর্য্যাদা রাখে। তাই য়ুরোপের নিতান্ত জঘন্য মনোবৃত্তির ফলস্বরূপ স্বৈরাচারের আদর্শও সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে এশিয়ায় উচ্চদরে বিক্রয় হয়। য়ুরোপ প্রসাদাৎ আজ আমরা শিখিয়াছি রাষ্ট্রীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যাপক নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই যজ্ঞের ফলের জন্য পরকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়না, ইহকালেই রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া অশেষবিধ ফল উপভোগ করা যায়। ইহার নামই পলিটিক্স।

অন্যায় কাজের একটি গুণ এই যে কিছুদিন চর্চা করিলে উহা যে অন্যায় সেই কথা একেবারে বিস্মৃত হওয়া যায়। 'হত্যা' কথাটি শুনিলেও আগে লোক শিহরিয়া উঠিত, এখন "রাজনৈতিক হত্যা' (Political •Murder) নামক পুণ্য কাজটির অনুষ্ঠান মানুষের বিবেককে দংশন ত করেই না বরং বেশ একটি রোমাঞ্চকর সদনুষ্ঠান বলিয়া প্রশংসিত হয়। অতি সামান্য এবং সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থে বিশখানা বগিযুক্ত রেলগাড়ীর সহস্রাধিক নিষ্পাপ শিশু-নারী-বৃদ্ধ-বালককে জীবন্ত সমাধি দিতে আজকালকার য়ুরোপীয় শিষ্যত্বাভিমানী রাজনৈতিক দল কিঞ্চিৎমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।

এইরূপ এক দুর্বুদ্ধির যুগ আমাদের দেশেও যে আসিতে পারে এমন আশঙ্কা একদা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করিয়াছিল, তাহার আভাস পাইয়াছিলেন তিনি এককালের সন্ত্রাসবাদী সঙ্ঘের কার্য কলাপের মধ্যে। রাজকর্মচারীদের গোপনে হত্যা করিয়া সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া ভারত হইতে ইংরাজ বিতাড়নের ষড়্‌যন্ত্রে ভারতের অনেক তরুণই এককালে যোগ দিয়াছিল। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ইংরাজ কর্মচারী যত না নিহত বা আহত হইয়াছিল, ভারতের তরুণ প্রাণের বলি হইয়াছিল তদপেক্ষা বেশী। স্বদেশের তরুণদের এই আত্মবলিদানে স্বভাবতই সকলের মত কবি ও মর্মাহত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদিতার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সর্বনাশ বলিয়া

তিনি যাহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা কয়েকজন তরুণের দৈহিক মৃত্যু নয়, জাতির মানসিক মৃত্যু, আদর্শের অপঘাত। এই বিজাতীয় রাজনৈতিক হত্যার আদর্শের মধ্যে কোন মঙ্গলই যে নিহত নাই, বরং জাতির বৃহৎ সর্ব্বনাশ যে ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাই বুঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ "চার অধ্যায়" নামক উপন্যাসখানি রচনা করেন। এককালে এই উপন্যাসখানি দেশে বহু বাগ বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু কবি তাহাতে বিচলিত হন নাই, বা ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন নাই। কেবল "চার অধ্যায়ের" ভূমিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনের যে কাহিনীটি তিনি জুড়িয়া দিয়াছিলেন, নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া পরবর্ত্তি সংস্করণ হইতে তাহাই তুলিয়া দেন।

উপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসী কিন্তু এককালে তিনি সন্ত্রাসবাদী সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের এই আমূল পরিবর্তন যেমন আকস্মিক; তেমনি বিস্ময়কর। কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে একদা তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।" ইহাই কবির সঙ্গে তাঁহার শেষ আলাপ। চার অধ্যায়ের ভূমিকায় এই সাক্ষাতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন—উপন্যাসের প্রারম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাসের ভূমিকায় এইরূপ সত্য কাহিনী জুড়িয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন সেই তর্ক তুলিব না। তবু এইটুকু বলিতেই হইবে চার অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়কে পাঠকদের গোচর করিবার জন্য, দেশের এক বৃহৎ সর্বনাশের সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করিবার জন্যই এক মনীষীর জীবনলব্ধ সত্যকে উন্মুক্ত করিয়া কবি দেশের সাম্‌নে তুলিয়া ধরেন।

সন্ত্রাসবাদ, হত্যা ও ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়াছে কিনা ভারতের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণ তাহা বিচার করিবেন, কিন্তু আজকের পৃথিবীর পানে তাকাইয়া "চার অধ্যায়ের" বক্তব্য বিষয়কে স্মরণ করিলে রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ছাড়া আর সকলেই

উপলব্ধি করিবেন মনুষ্যত্বের শাশ্বত ধর্মকে পদদলিত করিয়া যে আদর্শ রাজনৈতিক কারণে এককালে আমরা বরণীয় বলিয়া মনে করি, তাহাই আর এককালে কি বিরাট সর্বনাশকে ডাকিয়া আনে। যে সকল রাষ্ট্রবিদ ধুরন্ধর সন্ত্রাসবাদের সুড়ঙ্গপথ বাহিয়া য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আধিপত্য করায়ত্ত করিয়াছেন, তাহাদের সকলের জীবনের শেষ পরিণতির ইতিবৃত্ত আজও লেখা না হইলেও কয়েক-জনের হইয়াছে—যাহারা যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন জাতির বৃহৎ কল্যাণের প্রেরণায়, অথচ সেই যাত্রা শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কেবল অসংখ্য স্বদেশবাসীর শিরশ্ছেদের নিরবচ্ছিন্ন বিভীষিকার অন্তে নিজের শির ঘাতকের খড়্গের সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া। উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক পাপকে যে পাপের দ্বারাই রক্ষা করিতে হয়, এক হত্যার হাত ধরিয়া যে সহস্র হত্যা বন্যার মত আসিরা পড়ে বুদ্ধের এই বাণী য়ুরোপের হতভাগ্য কয়েকজন রাষ্ট্র ধুরন্ধর একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়া গেলেন। একটি আপ্ত বাক্য প্রচলিত আছে "নরকের পথ অসৎ উদ্দেশ্যে আস্তীর্ণ নহে"। যথেষ্ট সৎ উদ্দেশ্যেই ইউরোপের সন্ত্রাসবাদী দলগুলি নরহত্যার ব্রত লইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের নিজেদের নরকবাস আটকায় নাই।

'চার অধ্যায়ের' এলা-অতীন একদা বুঝিয়াছিল সন্ত্রাসবাদের সুড়ঙ্গপথ বাহিয়া তাহারা স্বাধীনতার সিংহদ্বারে পৌছে নাই, কেবল বাহিরের মুক্ত পৃথিবীতে তাহাদের স্ব-ধর্মের, তাহাদের আত্মার চলার পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে সমাধিলাভ করিয়াছে। কর্ম মাত্রেরই নিজস্ব একটি ধর্ম আছে, সন্ত্রাসবাদীদের কার্যও কর্মীদের নিকট দাবী করে পদে পদে মিথ্যাচরণ, মিথ্যাভাষণ, নির্বিচার নিষ্ঠুরতা, ষড়যন্ত্র, এককথায় বিভীষিকা সৃষ্টির সর্বপ্রকার গোপন আয়োজন। অতএব এই পথে যাহারা পা বাড়াইবে মনুষ্যত্বের, বিবেকের, সত্যানুসন্ধিৎসার আদর্শকে তাহাদের চিরতরে বিসর্জন দিয়াই বাড়াইতে হইবে। অতীন এই সত্য যখন আবিষ্কার করিল তখন তাহার আর ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। এইখানেই অতীনের জীবনের ট্রাজেডি। এই বিয়োগান্ত নাটক আজ আরও ব্যাপক আকারে য়ুরোপে অভিনীত হইতেছে। এশিয়াতে বিস্তারলাভ করিবার জন্য সে আজ ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" ইহারই বিরুদ্ধে আমাদের সাবধান করিতেছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে শিশু
ও
কি শো র

আজীবন রবীন্দ্রনাথ একটি কথা বার বার বলিয়াছেন। সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধিই আনন্দ। আমাদের অন্তরের ব্যক্তিপুরুষ স্বভাবতঃ এই আনন্দের জন্য তৃষিত থাকে। মানুষের সারা জীবনের কর্ম্মপ্রেরণার, সৃষ্টি-চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ও উৎস এই আনন্দ। কবি যে অজস্র কাব্য সৃষ্টি করিতেছেন তাহা কখনও ঐ আনন্দের আবেগে, কখনও ঐ আনন্দকে ধরিবার চেষ্টায়। মাঝে মাঝে বিষম বাধা আসে, নানা পার্থিব আকর্ষণ, দৈনন্দিন জীবনের কুশ্রীতা মনকে, দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে, তখন ভিতরের সঙ্গে বাইরের ঘটে সজ্ঘাত। এই সজ্ঘাতের পরিচয়টাও কবির কাব্যে ফুটিয়া উঠে, দুঃখের আগুনে দ্রবীভূত হইয়া কবিচিত্ত শ্লোকের ঝরণা ধারায় প্রবাহিত হয়। ভূমাকে লাভ করিবার এই যে অশ্রুমাখা আর্তি রবীন্দ্রনাথের মতে ইহারই সঙ্গীত সকল দেশের সকল কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য।

তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙায়রি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

রবীন্দ্রনাথ বলিবেন শুধু বিদ্যাপতি নহে, সকল কালের সকল কবির ইহাই একমাত্র সঙ্গীত, একমাত্র কাব্য।

কবি এক যায়গায় লিখিতেছেন "........আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবনযাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। বিশ্বজগতে এই

আনন্দসমুদ্রে কেবলি তরঙ্গলীলা চল্‌ছে, প্রত্যেক মানুষের জীবনটাকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা।……একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত, তুমি তখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এই জন্যে তোমার কাছে সেদিন সমস্তই অপরূপ ছিল, ধুলাবালিতে তখন তোমার আনন্দ ছিল, পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জানতে, দান বলে গ্রহণ করতে, এখন তুমি বলতে শিখেছ, এটা পুরোণো, ওটা সাধারণ, এর কোন দান নেই। - এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। জগৎ তেমনি নবীন আছে, কেননা, এযে অনন্ত রস-সমুদ্রে পদ্মের মত ভাসছে।" (শান্তিনিকেতন)

মানবশিশু শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মার মধুবৃন্দাবন। শিশুর মধ্যে অসীমের অবারিত প্রকাশ. পার্থিব সংস্কার. স্বার্থ, সংকীর্ণতা, অভ্যাস-জনিত অন্য মলিনতা তাহার মধ্যে ভূমার প্রকাশকে দৃষ্টির আড়াল করিতে পারে নাই। তাই দেশকালনির্বিশেষে শিশু নিত্যসুন্দর।

শিশুর অশেষ কৌতূহলের কথা সকলেই জানে। এই কৌতূহলের তাৎপর্য্য কি, হেতু কি আমরা প্রবীণ বিজ্ঞরা বুঝিয়াও বুঝিনা, তাই শাসন করিয়া, চোখ রাঙাইয়া, তাহার মুখরতাকে কাড়িয়া লই। কিন্তু কবির চিত্ত এই রহস্যের সন্ধান রাখে। তিনি জানেন অসীমের বুক হইতে একটি প্রাণশিখা এইমাত্র মানব শিশুরূপে মানবসমাজের গণ্ডীর মধ্যে ধরা দিয়াছে, অসীমের লীলাচঞ্চলতা এখনও তাহার বুকে প্রবল বেগে উৎসারিত, তাই সমুদ্র পর্বত, ভিন্ দেশের অদেখা ঝরণা, আকাশের তারা রূপকথার পাতালপুরী তাহাকে অনবরত ডাকিতেছে। তার নিমন্ত্রণ যেন লোকে লোকে।

ডাকঘরের শিশু অমলের চরিত্র শিশুর এই অদম্য কৌতূহল আর আবেগের রহস্যটির পরিচয় দিতেছে। শিশুটির 'অমল' নামকরণ লক্ষ্য করিবার মত একটি বিষয়। অমল বিশেষ কোন শিশু নয়, 'অমল' নিখিল শিশুপ্রাণ। শিশুর প্রভাব সর্বজনীন। বিষধর সর্প

ও শিশুর সম্মুখে আসিয়া তার প্রতিহিংসার কথা ভুলিয়া যায়—এমন গল্প দেশে দেশে প্রচলিত আছে। গল্প সত্য নহে, কিন্তু দেশকাল পাত্র নির্ব্বিশেষে মানবচিত্তে শিশুর অমৃত স্পর্শ যে স্বর্গীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া মানুষকে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও পার্থিব পারিপার্শ্বিকতার জঞ্জাল হইতে ঊর্দ্ধলোকে লইয়া যায় তাহা অবিসংবাদিত। George Eliot এর Silas Marner উপন্যাসের শিশু ইহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। অর্থগৃধ্নু Silas Marnerকে, একটি শিশুকন্যার ক্ষীণ কোমল দুইটি বাহু প্রেমের রাজ্যে ফিরাইয়া আনিল। ডাকঘরের মাধব দত্ত বলিতেছে—"জানতো ভাই অনেক কষ্টে টাকা করেছি, কোথা থেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাকবে, সে-কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু এই ছেলেটিকে আমার যে কীরকম লেগে গেছে"—মাধব দত্তের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ঠাকুরদাদা বলিয়া ফেলিলেন—"তাই, এর জন্যে টাকা যতই খরচ করছ ততই মনে করছ, সে যেন টাকার পরম ভাগ্য।" মাধব দত্ত তাহাই স্বীকার করিয়া বলে—"আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মত ছিল—না করে কোন মতে থাকতে পারতুমনা। কিন্তু, এখন যা টাকা করছি, সবই ঐ ছেলে পাবে বলে, উপার্জ্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।"

আমাদের নিকট জগৎখানা অর্থ দিয়ে ঘেরা। আমরা অর্থ খুঁজি, তাই আমাদের নিকট বস্তুতঃ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই, আছে আভিধানিক জগতের। অভিধানের গাছপালা, পাহাড় ঝরণা, তারা ফুল দূর নিকট, সৎ, অসৎ, আকাশ মাটির সঙ্গে বাহ্য জগতের এই সকল পদার্থের যে একটি ব্যবধান রহিয়াছে অভিধানই সেই কথা আমাদের ভুলাইয়া দেয়। পুঁথি বহিঃ জগৎ হইতে টানিয়া আমাদের তাহার নিজের জঠরে পুরিয়াছে এবং সেই জঠরের জারকরসে রঞ্জিত করিয়া পুরাদস্তুর সভ্য ও বিজ্ঞ মানুষ বানাইয়াছে। তাঁই আমরা পুথিকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি।

আকাশের তারা, মাটির ফুল আমাদের ডাকিয়া বলেনা—আমরা কিছু না, আমাদের অস্তিত্ব নাই, আমাদের সবই ভ্রান্তি, মূল্যহীন, আমাদের আলোটুকু পর্যন্ত মায়া মরীচিকা ; মণিকারের দোকানের হীরা পদ্মরাগ আমাদের বলিয়া দেয় নাই--তাহারা আমার বাগানের শিউলি কমল হইতে বেশী মূল্যবান। দিগন্তে বিলীয়মান বিসর্পিত পথ-রেখা, দিগ্‌ভ্রান্ত দিনান্তের স্বর্ণধারায় রঞ্জিত ধূসরতার ঘনীভূত মূর্ত্তি শিলাময় পাহাড়, তাহার বুকের স্বর্গের মন্দাকিনীর অজস্র ফুলফুটানো নৃত্য আমাদের জানায় নাই যে তাহারা পৃথিবীতে পড়িয়া আছে কেবল যাহাতে অফিসে যাইতে আমাদের বিলম্ব না হয়, আমাদের কোন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেন গণিতবিদ্যার একখানা গ্রন্থ লিখিতে পারেন, কিংবা আমাদের গোলাটি যেন সম্বৎসর নিরেট ভর্ত্তি হইয়া থাকে। পথ-সম্বল দইওয়ালা আর রাত-জাগা পাহারাওআলার জীবন রবীন্দ্রনাথের জীবনের তুলনায় যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা বুঝাইবার জন্য তাহাদের বিধাতা একখানা সারগর্ভ সংহিতা রচনা করেন নাই ; আকাশের আলোবাতাস চরক সুশ্রুত রচনা করিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দেয় নাই—আমরা কেবল তোমাদের রক্তে, নাড়ীতে, বায়ু-পিত্ত-কফের উদ্রেক ঘটাইবার জন্য আসা যাওয়া করিতেছি।

তাহা হইলে কি হয়? আমরা নিজেরাই প্রতিভাবলে বিশ্বের অলেখা পুঁথিতে এতগুলি অর্থ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছি। আমরা বিজ্ঞ, আমরা প্রাজ্ঞ। আর আমাদের সামনে বসিয়া আমাদের বিজ্ঞতাকে পরিহাস করিয়া অমল শিশু অসঙ্কোচে আমাদের যত্নে রচিত পুথিখানাকে অগ্রাহ্য করে, আর তাহার বড় বড় দুইটি চোখের সামনে সেই পুথি-খানাই টানিয়া লয় যাহা একেবারে সৃষ্টির আদিতে বসিয়া বিধাতা স্বয়ং কেবল তাহারই জন্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, মাটির ফুল আর আকাশের তারার অক্ষরে। এই পুথিতে গণিতশাস্ত্রের প্রতি নিতান্ত অবহেলা, রামায়ণ মহাভারতের যুগের সঙ্গে গতকল্যের কোন আড়াআড়ি নাই ; ভাগাভাগি নাই। হাজার ক্রোশ দূর বাড়ীর

পিছনের আমবাগানের প্রান্তে আসিয়া একেবারে মাতামাতি সুরু করিয়া দিয়াছে, ডাস্ ক্যাপিটেলকে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে এক মণ 'কাজ করা' অপেক্ষা একরত্তি 'কাজ-না-করা' বিধাতার জমা খরচের হিসাবে ঢের বেশী মূল্যবান। অমলের পুথির সঙ্গে আমাদের পুথির এইখানেই আস্‌মান জমিন ব্যবধান। তাই ত অমল বিজ্ঞপ্রাজ্ঞ মাধবদত্তের পায়ে পড়িয়া বলিতেছে—"আমি পণ্ডিত হবনা, পিসেমশায়, আমি পণ্ডিত হবনা।" ভাবী কালের কোন্ কার্ল মারক্‌স্ বুঝাইয়া দিবেন কারখানায় আটঘণ্টা হাতুড়ী পিটিয়া একখানা ইস্পাতকে বাঁকা করা অপেক্ষা একখানা পাহাড়ের কোল বাহিয়া নামিয়া আসা ঝরণার শীতল জলে পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকা ঢের বেশী বড় কাজ।

অমল শিশু, অমল অনভিজ্ঞ, অমল ভূগোল মাষ্টারের ক্লাস করে নাই, বাই-সাইকিলে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া চেম্পিয়নশিপও অর্জন করে নাই, কিন্তু আশ্চর্য্য, বিশাল ভূগোলটি যেন বিন্দু পরিমাণ হইয়া আপনিই অমলের অন্তরের মধ্যে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে।

"দইওয়ালা, তুমি কোথা থেকে আসছ।"

দইওয়ালা—আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল— তোমাদের গ্রাম? অনেক দূরে তোমাদের গ্রাম?

দইওয়ালা—আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমূড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল— পাঁচমূড়া পাহাড়—শামলী নদী—কী জানি হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি কবে সে আমার মনে পড়েনা।

দইওয়ালা—তুমি দেখেছ? পাহাড় তলায় কোনদিন গিয়েছিলে নাকি!

অমল— না কোন দিন যাইনি। কিন্তু, আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরানো কালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম—একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওয়ালা—ঠিক বলেছ, বাবা

অমল— সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওয়ালা—কী আশ্চর্য, ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গরু চরে বইকি, খুব চরে।

অমল— মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসী করে নিয়ে যায়—তাদের লাল শাড়ি পরা।"

এইটিই অমলের জগৎ—পাঁচমুড়া পাহাড়, শামলী নদী, অনেক পুরানো কালের খুব বড় বড় গাছের ছায়ায় ঘুমানো রাস্তা, পাঁচমুড়া পাহাড়ের গায়ে চরে-বেড়ানো গরু, লাল শাড়ি-পরা মেয়ে, নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসী নিয়ে রাস্তা বেয়ে চলে যাচ্ছে—এইত পৃথিবী। ভূগোলের ছাত্র অমলকে সংশোধন করিয়া বলিয়া ফেলিবে—না, না, পৃথিবীতে আরও পাহাড় আছে, তাহাদের সকলের নাম পাঁচমুড়া নয়, শামলী ছাড়া আরও নদী আছে যাহাদের অন্য নাম, সব দেশের মেয়েরাই লাল শাড়ী পরেনা, মাথায় করে কলসীও নেয়না। তাহারা কেহ বা বই, কেহ বা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে করিয়া বেড়ায়, কেহ কেহ আকাশ পথে স্পিট্‌ফায়ার চালনা করে।

ভূগোলের লেখা অর্থযুক্ত, তথ্য যুক্তিপূর্ণ বটে। কিন্তু কোন্‌টা সত্য ? কোন্‌টা অনাদি ও অকৃত্রিম ? ভ্যানিটি ব্যাগ আর বই হাতে মেয়ে ? না, নীল শাড়ী পরা কলসী মাথায় মেঠো গ্রামের পথে মন্থরগতি মেয়ে। কলিকাতার ভাগীরথীর শামলী পরিচয় অনেক চেষ্টা করিয়া আমরা ঘুচাইয়া দিয়াছি, কিন্তু, এখনও কি একেবারে সে পরিচয় লুপ্ত হইয়াছে ? ইটপাথর আর ইস্পাতের জাঙ্গালকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া সে কি চুপি চুপি আদিকালের সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃদু কুলু কুলু ধ্বনিতে আপনার গোপন কৈশোরের শামলী তনিমা মেলিয়া ধরিতেছে না ? ধরিতেছে। অনাদি কালের শিশু অমল জগতের এই অনাদি অকৃত্রিম রূপের সন্ধান রাখে। তাই অমলকে যদি কবি বলিতে চাও আপত্তি নাই, ঘোর বাস্তববাদী বলিতে চাও তাহারও সে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না।

অমল আমাদের জ্ঞানকে, আমাদের বুদ্ধিকে উপহাস করিয়াছে, চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে আমরা বিধাতার গড়া পৃথিবীতে বাস করিতেছিনা—বাস করিতেছি অভিধানের শব্দারণ্যে, কৃত্রিমতার কারাগারে।

এই কারাগার অমলকে বাঁধিতে চাহিয়াছিল, অমল পলাইয়া গেল। ডাকঘরের অমলের মৃত্যু লইয়া সারগর্ভ দার্শনিক সন্দর্ভ রচনার প্রয়োজন নাই।

অমল আমাদের ঘরের ছেলে, অনাদি কালের বিরাট শিশুর দোসর, খেলার সাথী, চরক সুশ্রুত আদালত অর্থনীতির গারদের মধ্যে তাহার খেলা জমাইতে না পারিয়া ঐ গারদের কোন্ ফাঁক দিয়া আপনার চির সাথীর কাছে চলিয়া গিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে "সুধার" অন্তর্লোকে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি॥

"সুধা" সেই অমৃত লোক, সেই নিত্য ধাম যাহা কলরব করিয়া আপনার ভালবাসা জানায় না, পৃথিবীর বুকে ফুলের নীরব ভাষায় সে বলে—"বোলো যে সুধা তোমাকে ভোলেনি।" সুধার মুখের কথা নয়, সুধার হাতের ফুলগুলির কথা। রাজ কবিরাজ আসিলে রোগ—যন্ত্রণা প্রশমিত হয়, অমলের ও হইয়াছিল। ইহার পরই মুক্ত আত্মা অমৃতধামে প্রয়াণ করে। সেই অমৃত ধামের চিঠি আসিয়া পড়িল। মালির মেয়ে সুধা। কে সে মালী? যিনি এই বিশ্বমালা রচনা করিয়াছেন? পার্থিব জীবনের মূল্য দিয়া তাহার ফুল কিনিতে হয়, তাই আগে অমল এই ফুল চাহিয়াও পায় নাই, পাইয়াছিল যখন সে আর ইহ লোকে নাই।

প্রশ্ন উঠিতে প্যারে কোন কালের কোন দেশের অমল শিশু কি ডাকঘরের অমলের ভাষায় কথা বলিয়াছে? না ও বলিতে পারে। কিন্তু শিশু যদি তার কৌতূহলের তাৎপর্য্য জানিতে পারিত তবে যাহা বলিত তাহার কথাটি কে বলিবে? কোন্‌শিশু কতটুকু বলিয়াছে সেইটিই

কবি লেখেন নাই, শিশু যাহা বলিতে পারিতেছে না অথচ অন্তরের মধ্যে যাহা ভাষা খুঁজিয়া ফিরিতেছে কবি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। অমলের কিংবা কবির অন্য শিশুর কথা চিরকালের শিশুর অন্তরের না-বলা বাণী। ফুল মানুষের ভাষায় কথা বলেনা। কিন্তু ফুলের রঙ্গীন পাপড়ির বাণী কবি অনায়াসে পড়িয়া ফেলেন।

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে"

(জন্মকথা-শিশু)

কোনদিন কোন শিশু তার মাকে এই জটিল প্রশ্নটি করে নাই। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়া সদ্যজাত শিশু ডাগর দুইটি চোখ মেলিয়া যখন ক্ষণিকের জন্য তার নূতন আবেষ্টনীর চারিদিক একবার চাহিয়া লয়, বড় বড় সেই চোখ দুইটির বাস্পাকুলতায়, অজানা ভয় আর বিস্ময়ের মধ্যে, এই একটি প্রশ্নই কি শুধু জাগিয়া উঠেনা, আমি কে, আমি কেন, আমি কোথায়?

বিশেষ কোন মায়ের গর্ভে বিশেষ এক সন্তানের জন্ম আকস্মিক ঘটনা নহে। বরং ইহা জন্ম জন্মান্তরের এক ডোরে বাঁধা দুটি প্রাণের অনিবার্য্য মিলন। আজকের জননী পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বেই পরপারের বৈতরণীর তীরে তাঁর আপন সন্তানদের রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা বহুকাল সেই নদীতীরে অপেক্ষা করিয়া অবশেষে তাহাদের পৃথিবীবাসিনী মাতার অঙ্কে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। আজকের জননী যে তাহাদের জন্ম জন্মান্তরের জননী। শুধু মা কেন, এই জন্মের দিদিমা ঠাকুরমারাও বার বার দিদিমা ঠাকুরমা হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন, কেবল এই নাতি নাত্‌নীদের কোলে লইবার জন্য। পৃথিবীতে আসিয়া মা, দিদিমা, তাহাদের কচি মুখগুলি ভুলিয়া যান, কিন্তু তাহাদের আলোক আঙ্গুলির স্পর্শ তাঁহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে সংগোপনে থাকিয়া সেই অন্তরের বাৎসল্যরসের ফল্গুধারাকে অস্থির করিয়া রাখে?

"মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে ॥
ছিলি আমার পুতুল খেলায়
প্রভাতে শিব পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি ॥
আমার চিরকালের আশায়
আমার সকল ভালোবাসায়
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরাণে—
পুরোণো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের পরে
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে।"
যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে ॥"

(জন্ম কথা-শিশু)

"জন্ম কথা" কবিতাটির এই কথাটিই অন্য ভাষায় কবি বলিয়াছেন "খোকা" নামক কবিতাটিতে—

"খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা—
জানকি সে যে এতটা কাল
লুকিয়ে ছিল কোথা।

মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরাণ ছেয়ে
মাধুরীরূপে মূরতি ছিল,
কহে নি কোন কথা,
খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা।"

সত্য শিব সুন্দরের আলোক-স্পর্শকে বহন করিয়া আদি কাল হইতে শিশু ধরণীতে আসিতেছে, যাইতেছে। নূতন হইয়াও সে যে চির পুরাতন। জগতের সকল শিশুই সেই প্রাণের প্রাণ গোপাল ; মাতৃত্বের স্বাদ পুরাইবার জন্য যে কৃপা করিয়া বারে বারে পৃথিবীর মায়ের কোল আলো করিয়া আসিয়াছে। সীমার মাঝে সেইত অসীম, পুত্র হইয়াও সেই যে পিতা। শিশু হইয়া মাতা-পিতার সেবা কাড়িয়া লইতেছে। আপনার অসীম আনন্দের দীপ্তিতে আমাদের মাটির দেহকে আলো করিয়া ফেলিতেছে।

"রাখাল বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাচনি
কিসের সুখে সহাসমুখে
নাচিছ বাছনি।"

খোকাকে আমরা দীন রিক্ত বলিয়াই জানি। কিন্তু খোকা কি দীন? খোকা কি কাঙ্গাল? খোকা দীন 'সাজিয়াছে, রিক্ত সাজিয়াছে, আমাদের প্রেম কাড়িয়া লইবার জন্য। গোপাল নিজে কাঁদিয়া আমাদের কাঁদায়, ব্যথা দিয়া আমাদের হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য।

"খোকার ছিল রতনমণি কত—
তবু সে এল কোলের পরে—
ভিখারিটির মতো।
এমন দশা সাধে?

দীনের মতো করিয়া ভান,
কাড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ
তাই সে এল বসন হীন
সন্ন্যাসীর ছাঁদে
"আমাদের খোকা কাঁদিতে জানিতনা ;
হাসির দেশে করিত শুধু—
সুখের আলোচনা।
কাঁদিতে চাহে সাধে ?
মধু মুখের হাসিটি দিয়া
টানে সে বটে মায়ের হিয়া,
কান্না দিয়ে ব্যথার ফাঁসে
দ্বিগুণ বলে বাঁধে।"

(শিশু—চাতুরী)

শিশু কাজ করে, আমরাও কাজ করি। শিশু কাজ করে ধুলি লইয়া তৃণ লইয়া, আমরা কাজ করি জমাখরচের খাতা লইয়া। কবি শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"হে চিত্ত! তুমি তখন অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা কোরতে······এখন তুমি বোলতে শিখেছ, এটা পুরাণো ওটা সাধারণ, এর কোন দাম নেই। এমনি কোরে জগতে তোমার অধিকার সংকীর্ণ হোয়ে আস্‌ছে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে।"

শিশুর কাজ প্রাণের, আনন্দের, জমাখরচের ধাঁধাঁর মধ্যে সে আনন্দকে আমরা আর খুঁজিয়া পাইবনা। চির সুন্দর আনন্দের খেলা বিশ্বে খেলিতেছেন অনাদি কাল হইতে, সেই বিরাট শিশু ধরণীর বুকে ছোট্ট শিশুটি হইয়া নূতন খেলা জমাইয়াছে। আমরা রতণমণি ধূলায় ফেলিয়া কাচখণ্ড লইয়া সংসার জমাইয়াছি। আমাদের সেই হারাণো মণি শিশু কুড়াইয়া লইয়াছে—

বাছারে মোর বাছা,
খেলিতে ধুলি গিয়েছি ভুলি'

লইয়ে তৃণ গাছা।
কোথায় গেলে খেলনা মেলে
ভাবিয়া কাটে বেলা,
বেড়াই খুঁজি করিতে পুঁজি
সোনা রূপার ডেলা।
যা পাও চারিদিকে
তাহাই ধরি তুলিছ গড়ি
মনের সুখটিকে

(শিশু—নির্লিপ্ত)

কবির শৈশব গিয়াছে, আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া তাহাকে শতবার ডাকিলেও ফিরিয়া পাওয়া যাইবেনা। ফিরিয়া আসিবেনা সেই অমল আনন্দ, সেই অ'শাতীত। আনন্দ হইতে আমরা আসিয়াছিলাম, আবার সেই আনন্দেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। আকাশ পারের বিরাট শিশু ছোট্ট মানব শিশুর মূর্ত্তি ধরিয়া আমার মনের সুপ্ত আনন্দের আর্তিকে নূতন করিয়া জাগাইয়া দিল।

"না পাই যারে চাহিয়া তারে
আমার কাটে বেলা,
আশাতীতেরি আশায় ফিরি
ভাসাই মোর ভেলা!"

(শিশু—নির্লিপ্ত)

এই ভাবে কবির কাব্যে মানবশিশু একাধিকবার সেই বিরাট শিশুর মূর্ত্তি ধরিয়াছে, যে শিশু অদৃশ্যে থাকিয়া মুঠি মঠি সোনার কিরণ আর সোনার ধুলি লইয়া বিশ্বের খেলাঘর নিমাণ করিয়াছেন। একেবারে ভাবিয়া ও দেখেন নাই এত আলো এত ধুলো এত সবুজ, এত বিরাট আকাশ কোন্ কাজে আসিবে?

"রঙ্গিণ খেলনা দিলে ও রাঙ্গা হাতে
তখন বুঝিরে বাছা, কেন যে প্রাতে
এত বঙ খেলে মেঘে, জলে রঙ ওঠে জেগে,

কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে,—
রাঙ্গা খেলা দেখি যবে ও রাঙ্গা হাতে ॥

* * *

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি—
হাসিটি ফুটিয়ে তুলি তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে,
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি ॥”

(শিশু—কেন মধুর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত, প্রকৃতির কোল হইতে আমরা অভিধানের শব্দার্থের অরণ্যে বাসা বাঁধিয়াছি, আনাগোনা করিতেছি 'মোহমুদ্গর' আর গণিতের পাতায় পাতায়। আমাদের কাছে প্রকৃতি কেবল গাম্ভীর্য্যে আর তত্ত্ব কথায় ভরা। কিন্তু চিরশিশু কবিটিকে প্রকৃতি কেবল তার চির আনন্দ সভার নিমন্ত্রণ জানাইয়া রাখিয়াছে, প্রভাতের সোনার অক্ষরে সে নিমন্ত্রণের পত্রখানি লেখা।

“যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে
আশার অতীত যারা সবে,
খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে ॥
খোকার মনের ঠিক মাঝখানে ঘেঁসে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টি শেষে—
সকল উদ্দেশ হারা
সকল ভূগোল ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে,
যেথা আসে রাত্রি দিন

স'ব ইতিহাস হীন
রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া,
তারি যদি একধারে
পাই আমি বসিবারে
দেখি কারা করে আসা যাওয়া
* * *
নেই তারা কোন কর্ম কাজে,
চিন্তাহীন মৃত্যুহীন
চলিয়াছে চিরদিন
খোকাদের গল্পলোক মাঝে।" (শিশু খোকার রাজা)

কিংবা "সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য শশী
খোকার সাথে হাসে যেন
এক বয়সী।
* * *
খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে
বিশ্ব জগৎ।"
(শিশু—ভিতরে ও বাহিরে।)

খোকাকে প্রকৃতি মাতা তাঁহার অন্তঃপুরের খেলাঘরে লইয়া গিয়াছেন আর 'বিশ্ব গুরু মহাশয়' আমাদের ফেলিয়া গিয়াছেন তাঁর ভূগোলের ক্লাসে। "খোকা পড়ে থাকে জগৎ মায়ের
অন্তঃপুরে।
আমরা থাকি জগৎ পিতার
বিদ্যালয়ে"
(ভিতরে ও বাহিরে)

এই বিদ্যালয় হইতে ছুটি লইবার জন্য খোকার মন ছটফট করে। সে যাইবে সেই দেশে "যেখানে কোন জিনিষের কোন ভার নেই—

যেখানে একটু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়।”
(ডাকঘর)

এই দেশ প্রবেশ করিবার পথ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। “বিশ্ব গুরু মহাশয়” আমাদের বার বার হাঁটাইয়া কেবল বিদ্যালয়ের পথখানাকেই পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু খোকার সমবয়সী ঠাকুরদাদা জানেন “ভিতরের দিক দিয়া একটা রাস্তা আছে,” যে রাস্তা দিয়া জগৎ মায়ের ছুটির অন্তঃপুরে পৌছানো যায়।

খোকার আসন এইখানে, তাই খোকার আবেদন

“আজকে আমি লুকিয়েছি মা,
পুঁথিপত্তর মত,—
পাড়ার কথা আজ ব'লোনা,
যখন বাবার মতো
বড় হব, তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ,
আজ বল মা, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।”

(শিশু ছুটির দিনে)

খোকা বিদ্যালয় হইতে ছুটি লইয়াছে বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের চরম তত্ত্বটি রপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আইনষ্টাইনের দরকার হয় নাই, খোকা জগন্মাতার খেলাঘরে বসিয়া শিখিয়া নিয়াছে স্থান এবং কাল Time and space দুইটাই মানুষের মন গড়া, অতএব ইচ্ছামত তাহাদের রদবদল করা যায়।

“খোকার হাটের সবাই এল ফিরে
মাঠের থেকে এল চাষির দল।
মনে কর্‌না উঠল সাঁঝের তারা,
মনে কর্‌না সন্ধ্যে হল যেন।
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবেনা কেন?

(শিশু—প্রশ্ন)

খোকার অদ্ভুত জ্যোতিষ শাস্ত্র।

"চাঁদ যে আকে অনেক দূরে
কেমন করে ছুঁই।"
আমি বলি "দাদা তুমি জানোনা কিছুই।
মা আমাদের হাসে কখন ঐ জানালার ফাঁকে
তখন তুমি বলবে কি মা অনেক দূরে থাকে।"

(শিশু জ্যোতিষ শাস্ত্র)

এই অকাট্য যুক্তি কোন্ আইনষ্টাইন না মানিয়া পারিবেন ?

শিশু অনুক্ষণ জগৎ মাতার অন্তঃপুরে থাকিতে চাহে বটে ; কিন্তু পৃথিবীর জননীর কোল ছাড়িয়া নয়, আপন জননীর অন্তঃপুরে বসিয়া সে সেই অন্তঃপুরে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। ভয় কেবল তাহার সেইখানে, যেখানে তাহার মায়ের কোল নাই। মায়ের খোকা বলিয়া মধুর ডাকা নাই। মাই তাহার দুই জগতের নির্ভর যোগ্য সেতু, আর কেহ আপন নাই তার। শ্বাপদ সঙ্কুল পৃথিবীর মাটিতে আসিয়া জগৎ মাতা পৃথিবীর মাতা সাজিয়া খোকাকে বুকে লইয়া বসিয়া আছেন কিনা কে জানে ? "শিশু" কাব্য গ্রন্থটিতে কবি কেবল শিশুর অমল চিত্তখানিই মেলিয়া ধরেন নাই। শিশুর মাতার চিরসত্য পরিচয়কেও খুলিয়া ধরিয়াছেন। জননীর সন্তান ছাড়া আর কে আছে ? স্বামী. সংসার, রূপ, বিদ্যা, পূজা, ভালবাসা সবইত ভার বোঝা যেখানে খোকার 'মা' ডাকা নাই। রবীন্দ্রনাথ বহু যায়গায় বহুভাবে বলিয়াছেন মাতৃজাতির সমস্ত সত্তা আকৈশোরে উৎকর্ণ হইয়া থাকে শুধু এই একটি ডাক শুনিবার জন্য। তাইত শিশু কাব্যের মাতা বলিতেছেন।

"ছিলি আমার পুতুল খেলায়,
প্রভাতে শিব পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের মনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি। (শিশু-জন্মকথা)

আর সেই মায়েরই শিশু বলিতেছেন—

“তারা বলে” এস মাঠের শেষে
সেই খানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে।”
আমি বলি, “মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে।
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ
দুহাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ।”

(শিশু-মাতৃ বৎসল)

এই শিশু যদি কখনো হারাইয়া যায়, সংসারে মায়ের আর কি থাকে? মা তাই ডাক ছাড়িয়া কেবল কাঁদিয়া বলেন—

‘এ জগৎ কঠিন কঠিন
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া
সেই খানেতে আয় মা ফিরে আয়।
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া।”

(শিশু-আকুল আহ্বান)

যে কোমল প্রাণ শিশুকে মাতৃবৎসল করিয়াছে। সেই সহজাত কোমলতাই শিশুকে করিয়াছে বিশ্ব প্রেমিক। স্মার্ত পণ্ডিতের পাঁজিখানাত সে পড়ে নাই, পবিত্র অপবিত্রের বাদ বিচারও জানেনা। শুধু জানে ভালোবাসিতে হয় সকলকে। জন্ম হইতেই শিশু অদ্বৈত-বাদী। একদিকে সমগ্র বিশ্ব তাহার বুকের মধ্যে, তাহার মায়ের মধ্যে, আসিয়া খেলা করিতেছে। অন্যদিকে তাহার নিজের সঙ্গে তাহার কুকুর ছানাটিরও ব্যবধান তাহার একেবারে অজ্ঞাত। তাইত মাকে সে সোজা বলিয়া ফেলিল—

"যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা--
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?
সত্যি করে বল্
আমায় করিস নে মা ছল
বলতে আমায় "দূর দূর দূর।
কোথা থেকে এল এই কুকুর ?"
যা, মা, তবে যা, মা
আমায় কোলের থেকে নামা
আমি খাবনা তোর হাতে
আমি খাবনা তোর পাতে ॥"

(শিশু--সমব্যথী)

'শিশু' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ শিশু চরিত্রের প্রায় সমস্ত দিকই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। শিশুর মগ্ন চৈতন্যে বীরত্বের একটা স্পৃহা ঘুমাইয়া থাকে, অসম্ভব কিছু করিয়া বড়দের তাক লাগাইয়া দিবার উদগ্র কামনা থাকে। আর থাকে বড়দের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা। 'শিশু' কাব্যের 'বীরপুরুষ', বেড়াল ছানার 'মাষ্টার বাবু', খুকির 'বিজ্ঞ মাষ্টার', 'ছোটোবড়ো', 'তুঃখহারি' ইত্যাদি তাহারই প্রমাণ। শিশুকে যে সকলেই ভালবাসে, বিশেষ করিয়া তাহার মাতা যে তাহাকে না দেখিয়া একান্তে থাকিতে পারেন না তাহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় না। মায়ের এই তুর্বলতার সুযোগ লইয়া শিশুমাত্রকেই কিছু না কিছু সুবিধা আদায় করিয়া লইতে দেখা যায়। মারিবার জন্য তাহাকে তাড়া করিলে সে মাকে নিরস্ত করিবার এই শেষ বাণটি নিক্ষেপ করে—মা, আমি কিন্তু মরিয়া যাইব। আর আসিব না। বলাবাহুল্য এই অমোঘ অস্ত্রে সে মায়ের হস্তধৃত বেত্রকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। অবশ্য অস্ত্রটি তাহার মায়ের নিকট হইতেই

পাওয়া। মাই দুরন্ত শিশুকে বশ করিবার জন্য প্রায় বলেন—মায়ের কথা না শুনিলে মা মরিয়া যায়। শিশু তাহাই সুযোগ বুঝিয়া মায়ের উপর প্রয়োগ করে।

"তবে আমি যাইগো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা বলে,
বলব আমি নাই সে খোকা নাই।"

অতএব শিশুকে বোকা বলিলে চলিবেনা। শিশুর কার্যকরী বিদ্যার অভাব নাই।

কিন্তু শিশু কাব্যগ্রন্থের শিশুটি মাকে খুব বেশী আঘাত দিতে পারেনা, সে যে বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবে, তাহাও একরকম লুকোচুরী খেলামাত্র। আসলে সে কোথাও যাইবেনা, হাওয়া হইয়া, ঢেউ হইয়া, আকাশের তারা হইয়া সে ত আসলে মায়ের বুকে, মায়ের প্রাণে, মায়ের আঁখি তারায় মিলিয়া থাকিবে। শিশুর এই জাতীয় কল্পনা, কিংবা সে নিজে চাঁপার গাছে চাঁপা হইয়া ফুটিলে যে অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহা লইয়া তাহার রীতিমত logical গবেষণা শিশুর পক্ষে সম্ভব কিনা এই প্রশ্ন অনেক পাঠকের মনেই উদয় হয়। কিন্তু একটি কথা স্মরণে রাখিতে হইবে শিশুর মত নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার অধিকারী বলিয়া কোন বিলাতী খেতাবওয়ালাও গর্ব করিয়া বলিতে পারিবেন না। এই প্রতিভাবলে শিশু নিত্য গবেষণা করিতেছে— আকাশে ঘোড়া ছুটাইতেছে, মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়াটি সাবমেরিন্ হইয়া সাগরতলার কুচবরণ কন্যার পুরীতে প্রবেশ করিতেছে, সামনের দেয়ালটা, টুলটা গুরু মশায়ের পোড়ো হইয়া যাইতেছে, উঠানের চাঁপা ফুলটা ভগ্নী হইয়া ডাকাডাকি সুরু করিতেছে। এই গেল কল্পনার কথা। বাস্তবক্ষেত্রেও শিশুকে জগতের সঙ্গে আমরা কতটুকু পরিচিত করাই। এইখানেও কি তাহার প্রতিভা, তাহার একাগ্র দৃষ্টিই তাহার সত্যিকার সম্বল নহে! কি অমিত প্রতিভাবলে ছোট্ট শিশু এতবড় জগৎটাকে ধীরে ধীরে

আয়ত্ত করিয়া লয়, ইহার ভাষা শিখে, ইহার গাছপালা, পুকুর মাটিকে জানে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। লুকোচুরি খেলা শিশুর সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য খেলা। তাহাকে যে অন্যে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অথচ পাইতেছেনা, এই কল্পনার মধ্যে তাহার অসীম আত্মতৃপ্তি। কিন্তু ধরাত সে পড়েই। পৃথিবীতে একেবারে লুকাইয়া থাকিবার যায়গা কোথায়। খোকাকে যে সবাই চেনে। একমাত্র উপায় চেহারা-খানাকে বদলাইয়া ফেলা। তখন যে মজা হইবে তাহার তুলনা কোথায়? কিন্তু মায়ের মনে কষ্ট দিয়া এই মজাত সে ভোগ করিতে পারেনা। তাই—

"সন্ধ্যাবেলা প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ করে মা, পড়ব ভুঁয়ে ঝরে
আবার আমি তোমার খোকা হব
"গল্পবল" তোমায় গিয়ে কব
তুমি বলবে 'দুষ্টু, ছিলি কোথা?'
আমি বলব, বলব না সে কথা।"

(শিশু—লুকোচুরী)

রবীন্দ্রনাথের অপর শিশুকাব্য "শিশু ভোলানাথ" শিশু কাব্যেরই প্রতিধ্বনি। এই কাব্যের কবিতাগুলির ভাষা স্বতন্ত্র। ভাব শিশু কাব্যেরই অনুরূপ। কেবল এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা শিশু ভোলা-নাথই কিছু বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। এই কবিতার শিশু 'ভোলানাথ' উমাপতি ভোলানাথের ভুলের ঝুড়িটি কাড়িয়া লইয়া মাটির ভোলানাথ, নিঠুর সন্ন্যাসী সাজিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে এই সন্ন্যাসী ঠাকুরটি যে কতবার কতভাবে প্রবেশ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ

ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ বিবিধ সাজে

(চিত্রা-সাধনা)

এই কবিতা যখন কবি লিখিতেছিলেন, কিংবা লিখিতেছিলেন

"তাই এ ধরারে
জীবন উৎসব শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎ পাত্রের মত যাও ফেলে।
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার·········॥

(বলাকা—সাজাহান)

তখনো সর্বকীর্ত্তিভোলা এই সন্ন্যাসীটিই যে অন্তরে তাঁহার উঁকি দেয় নাই একথা বলা যায়না। নটরাজ ঋতুরঙ্গ শালায়, বন বাণীতে, পূরবীতে, বলাকায়, চিত্রায়, কোথায় তিনি নাই? রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল কাব্যেই এই একটি কথা অসংখ্যবার অসংখ্য রকমে বলিয়াছেন। কবি-মানসের একমাত্র দেবতা, তাঁহার কাব্যের একমাত্র আদর্শ সব ভোলা, সর্ববন্ধনের অতীত চির সন্ন্যাসী, চিরসুন্দর সত্য শিব। ইনিই আনন্দধাম, ইনিই রস, তাই ইনিই কাব্য। তাই একটি প্রশ্নের উত্তর জানিতে ইচ্ছা হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্ব্বোতমুখী সত্য, তিনি লেখেন নাই এমন কি বস্তু আছে? কিন্তু সত্যই কি রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতা লিখিয়াছিলেন? যাহা হোক, এ লইয়া আমি পাঠকদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইতে চাহিনা। কেবল এই কথাটিই স্মরণে রাখিলে চলিবে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল সৃষ্টিতে অদ্বৈত আনন্দকে ছন্দে ছন্দে উৎসারিত করিয়াছেন।

মানবশিশুকে দেখিয়াই পুরাণকার ভোলা মহেশ্বরের কল্পনা করিয়াছিলেন ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। ধূর্জটি আপন সাধের সৃষ্টিকে তাণ্ডব নৃত্যে আপনিই লণ্ডভণ্ড করেন—সৃষ্টি এবং ধ্বংস উভয়ে তাঁহার সমান আনন্দ। কিংবা ধ্বংস বলিতে কিছুই নাই,

ধ্বংসও সৃষ্টির আর একটি অধ্যায় মাত্র। সচ্চিদানন্দের আনন্দলীলা এমনি নব নব পর্য্যায়ে নব নব রূপে প্রকাশ পায়।

আমাদের অন্য দেবতাগুলি যে-স্বর্গেই থাকুন, আত্মভোলা, সর্বভোলা ভোলানাথ আর রাখাল-বেশী কাঙ্গাল সখা চিরকালই ধরিত্রীর মাটির প্রাঙ্গণে খেলাঘর পাতিয়াছে আর ভাঙ্গিয়াছে।

"ওরে মোর শিশু ভোলানাথ
তুলি দুই হাত
যেখানে করিস পদপাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ড ভণ্ড হয়ে যায় সব,
আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে,
* * *
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংস মাঝে মুক্তি দিস অনর্গল
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা শৃঙ্খল।"

(শিশু ভোলানাথ)

একবার কবি তাঁহার জীবনদেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন "হে দেবতা তুমি আমাকে বিস্মৃতি দাও, আপন সৃষ্টির বিস্মৃতি, আপনার কর্মবন্ধনকে আপনি ছিন্ন করিয়া, পিছনকে ভুলিয়া যেন পথের আনন্দ বেগে, পাথেয় ক্ষয় করিয়া আমার অনন্ত সম্মুখ পানে আগাইয়া যাইতে পারি।

"দেবী, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান
পেয়েছি অনেক ফল,
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক,
যতদিন থাকে ততদিন থাক,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক ধুলার মাঝে"

(চিত্রা—সাধনা)

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে

*   *   *

স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্ব পথে বন্ধনবিহীন"

(বলাকা—শাজাহাম)

"শুধু ধাও শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও
ফিরে নাহি চাও,
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লওনা কিছু, করনা সঞ্চয় ;
পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।"

শিশু ভোলানাথের নিকট কবির প্রার্থনাটিও যেন একই সুরে বাঁধা। এই কাঙ্গাল সন্ন্যাসীর নিকটও সেই একই প্রার্থনা

"ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত বলে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে,
ফেরে চিত্তে মোর
সকল ভোলার ঐ ঘোর
খেলেনা ভাঙ্গার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্ত্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।"

(শিশু ভোলানাথ)

এই আনন্দেরই পশরা জমাইয়াছেন কবি তাঁহার শারোদৎসবে, মুক্তধারায়, রক্তকরবীতে, ফাল্গুনীতে চিরকিশোর কিশোরীদের নন্দন কাননে।

এই নাটকগুলির প্রত্যেটির সুর যে একই তাহা অবিসম্বাদিত। শারোদৎসবের কিশোর উপানন্দ চির আনন্দের রাজাটিকে পাইয়াছিল

বেদনা ও নিরন্তর ত্যাগের মধ্য দিয়া, শরৎ প্রকৃতির সুন্দরের সভাতলে। দুঃখের মূল্য দিয়া সে খাঁটি রতন লাভ করিয়াছিল।

ফাল্গুনীর চন্দ্রহাসকে অগ্রণী করিয়া কিশোরের দল তাহাকেই পাইয়াছিল—"যে বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম। পাইয়াছিল নবীন প্রাণের বসন্তে।"

"তোমার শেষ নাহি তাই শূন্য সেজে
শেষ করে দাও আপনাকে যে
ঐ হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের বেদন
ও মোর ভালবাসার ধন॥"
অকূল প্রাণের সাগর তীরে
ভয় কীরে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে।
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে। (ফাল্গুনী)

ইহারা শিশু নয়, কিশোর, কিন্তু ইহাদের রাজ্যেও পুথি নাই। অর্থ নাই, পিছনে চাওয়া নাই, সঞ্চয় নাই, জগৎ মাতার অন্তঃপুরের খেলাঘরে ইহাদেরও চিরকাল ছুটি।

"যারা মরে অমর বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগদিগন্তে তারা রটাচ্ছে আমরা পথের বিচার করিনি আমরা পাথেয়র হিসাবে রাখিনি—আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি।"

(ফাল্গুনী)

মৃত্যুকে এরা জয় করেছে। এরাইত তারা যাদের "ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া নৌকাটির মতো এসে ঠেকেছে।" মৃত্যু নাই। কেবল

"জয়ী প্রাণ চির প্রাণ
জয়ীরে আনন্দ গান

জয়ী প্রেম জয়ী ক্ষেম
জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে।"

যে সব পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, যাহারা পুরাতন, তাহারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়া আপনাদের চির নবীনতা প্রকাশ করিল। ফাল্গুনীর কিশোরদের ললাটে সেই নবীনের অরুণোদয়।

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম
বারে বারে
ভেবেছিলাম ফিরব না রে
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয় দ্বারে—॥

(ফাল্গুনী)

একদা বর্ষশেষের প্রবল ঝটিকাও কবির কাছে এই বাণীই বহন করিয়া আনিয়াছিল। প্রাণময় বিশ্বের সঙ্গে যদি মিতালি ঘটাইতে হয়, যদি লাভ করিতে হয় সেই অশেষকে সেই সচ্চিদানন্দ ভোলা সন্ন্যাসীকে তাহা হইলে মৃত্যুর সঙ্গে মিতালি ঘটাইতে হয়। আত্মভোলা কিশোরের মত পূর্ব্ব সঞ্চয়কে পথে পথে ক্ষয় করিয়া চলিতে হয়।

উত্তর কুটের সিংহাসনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া, মৃত্যুর উঁচু প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মুক্ত কিশোর অভিজিৎ নিখিল বিশ্বের মুক্তধারায় আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিল। মুক্তধারাতেও সেই ভোলা সন্ন্যাসী। পৃথিবীর মুক্তধারার তটে নামহীন, গোত্রহীন কিশোররূপে ভাঙ্গনের দেবতারূপ অকস্মাৎ উদয় হইয়াছিল, পৃথিবীর পুঞ্জীভূত জঞ্জাল ও স্বার্থপরতার বুকে মুক্ত ধারার (মুক্ত আত্মার) পথ কাটিয়া দিয়া অমৃতের সঙ্গে তাহার সংযোগ বাঁধিয়া দিবার জন্য। অভিজিৎ জন্মগ্রহণ করিবার সময় গিরিরাজ তাহাকে পথে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ঘরের শঙ্খ তাহাকে ঘরে ডাকে নাই। তাইত ওর সম্বন্ধে বাউলের গান—

---ওত আর ফিরবে নারে, ফিরবে না আর, ফিরবে নারে।

ঝড়ের মুখে ভাসল তরী
কূলে আর ভিড়বে নারে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে
কাঁদন গেল পিছে রেখে
ও কে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে নারে।

'মুক্তধারায়' অভিজিৎ বলিতেছে— জন্মফলের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।" আনন্দ হইতে জন্ম আমাদের, আনন্দেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। মর্ত্যের বালুচরে সেই আনন্দের মুক্ত ধারাকে বহাইয়া দিবার জন্যইত আনন্দঘন মূর্ত্তি চির কিশোর কখন ও অভিজিৎ নামে, কখনও ভগীরথ নামে আমাদের মধ্যে আসিয়া থাকেন।

মুক্তধারা বাহিরে নয়, মুক্তধারা যে অন্তরে। অন্তরের মধ্যে তার নৃত্যের তাল অনুভব করা চাই।

"বাজেরে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে হৃদয় মাঝে।"

(মুক্তধারা)

"মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর" মুক্তবেণীর এই মুক্তধারায় ডুব দিয়াইত যুগে যুগে কালে কালে মাটির মানুষ অমৃতের পুত্র হইয়াছে।

"জয় সংশয় ভেদন,
জয় বন্ধন ছেদন
জয় সংকট সংহর
শঙ্কর শঙ্কর।
*   *   *
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর,
শঙ্কর শঙ্কর।"

(মুক্তধারা)

"রক্ত করবীতে" অবিকল এই মুক্তধারারই বাণী আনিয়াছে কিশোর রঞ্জনের শিষ্যা কিশোরী নন্দিনী। রক্ত করবীর জালখানা বর্তমান যুগের যান্ত্রিকতার সর্বগ্রাসী স্বার্থপরতার দুর্ভেদ্য আবরণ, অনেকটা মুক্তধারার লৌহবাঁধ। তার একদিকে আছে তাল তাল সোনা, একেবারে রসহীন গন্ধহীন বর্ণ-সর্বস্ব পাথরভার সোনা। সেই স্তূপীকৃত জগদ্দল স্বর্ণ-প্রস্তরের চাপে সেই পারের লোকদের প্রাণনামক নন্দিতা স্রোত ধারাটি একেবারে হাজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্মগত পরিচয় পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। মানুষ হইয়াও তাহারা মানুষ নহে, তাহারা কতকগুলি সংখ্যা মাত্র—৪৭ক, ১৬৯ফ। অথচ ইহার জন্য তাহাদের দুঃখও নাই, কারণ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে ৪৭ক পরিচয় ছাড়াও অন্য পরিচয় তাহাদের কখনো ছিল বা থাকা সম্ভব। আধুনিক ভাষায় ইহাকেই ত বলে প্রগ্রেস্, ইণ্ডাস্ট্রিয়েলিজেশন্। সুবৃহৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের মানুষ নামধেয় এই কল্‌কব্‌জা গুলির আবার নাম কি? পৃথক পরিচয় কি? ইহারা সোনা তুলিবে, কয়লা ভাঙিবে, সেই তোলার ভাঙার হিসাব রাখিবে। রাষ্ট্রযন্ত্র যেভাবে চালায় সেইভাবে চলিয়া. ভাঙিয়া-মরিয়া যন্ত্রটাকে চালু রাখিবে। কেবল সময়ের অপেক্ষা, একদিন হয়ত সারা ভুবন আর সারা আকাশ খানাকে ইহারা তাল তাল সোনার পাত দিয়া মুড়িয়া দিবে, যাহাতে নিরর্থক ঐ আকাশের আলোবাতাস, এই পৃথিবীর সবুজ এই যন্ত্র-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া কাজের ব্যাঘাত না ঘটায়, অকস্মাৎ কোন অসতর্কতার ফাঁকে ভাবাইয়া না দেয় যে ইহারা মানুষ, ইহারা প্রাণী, ইহারা ব্যক্তি। আয়োজনটা একরকম সেইরূপই চলিতেছিল। কিন্তু যন্ত্ররাজের সমস্ত সতর্কতাকে, সমস্ত ক্রুটিহীন ব্যবস্থাকে একেবারে বিচূর্ণ করিয়া যন্ত্রের মধ্যেও প্রবেশ করিল প্রাণ, যেমন ইট্‌পাথরের বুক ফুঁড়িয়াও রক্ত করবীর প্রফুল্ল মুখ হঠাৎ একদিন দেখা দেয়। সবুজ প্রাণের ঐ অতি ক্ষুদ্র একখানি জয় নিশান আকাশ চুম্বী প্রস্তরপর্বত খানাকেই একেবারে মিথ্যা বানাইয়া দেয়, ডাকিয়া বলে এই যে রাশি রাশি পাষাণ ইহারা একেবারে মিথ্যা, সত্য কেবল

আমি, আমি ক্ষুদ্র রক্ত করবী। এইত আমি এই পাষাণের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, আমার আলো, আমার হাসি ছড়াইয়া দিলাম, আমি যে প্রাণ! আমিই যে আছি আদিতে, আছি মধ্যে, আছি শেষে।

তাহাই হইল, যন্ত্রবাষ্ট্রের নাড়ি নাড়িতে হঠাৎ একদিন প্রাণের সাড়া জাগিল। যন্ত্ররাজ প্রাণকে নিষ্পেষণ করিতে গিয়া প্রাণের ফাঁদে পড়িয়া গেলেন। 'রক্ত করবী'র কিশোরী নন্দিনী এই প্রাণের মূর্তিমতী প্রতিমা। কিন্তু যন্ত্রেরও শক্তি আছে! দানবীয় শক্তি, তাহার চাকার তলায় পড়িলে রক্ষা নাই। পাথর যখন উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে বহু রক্তকরবীর চারাকে পিষিয়া মারে। নন্দিনীর কিশোর সখা রঞ্জন এই পাথরের চাপে প্রাণ হারাইল। কিন্তু ইহা ছাড়াও রঞ্জনের মৃত্যুর মধ্যে আর একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে। 'মুক্তধারার' অভিজিৎ মুক্তধারার স্রোতকে বন্ধন মুক্ত করিয়া নিজে নিখিল বিশ্বের মুক্তধারার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর স্থুলতার মধ্যে তাহার স্থান নাই। রঞ্জন কেবল নন্দিনীর সখা নহে, নন্দিনীর শক্তির উৎস, অলক্ষ্যে থাকিয়াও নন্দিনীর হৃদয়ের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ ছিল, সে-ই নন্দিনীর প্রাণের প্রাণ। এই প্রাণই মুক্ত, বুদ্ধ, শুদ্ধ। তাই 'ডাকঘরের' অমলের মত, 'মুক্তধারার' অভিজিতের মত রঞ্জনও বিশ্বের সেই প্রাণারামের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

ইহাদেরই "ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া নৌকাটির মত এসে ঠেকেছে"। দুই ভুরুর মাঝখানটাকেই শ্রুতি বলিয়াছে কূটস্থান। এই কূটস্থানেই ভগবান চৈতন্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সমুদয় পার্থিব কামনা পরিত্যাগ করিয়া যিনি স্থিত প্রজ্ঞ হইয়াছেন তিনিই কূটস্থ এই চৈতন্যের সঙ্গে শায়িত হইয়া শিবত্ব লাভ করেন।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞ স্তদোচ্যতে॥

(গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৫ শ্লোক)

কর্ম করিয়া ইঁহারা কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হননা, ইঁহারা "ত্যক্ত সর্ব্ব পরিগ্রহঃ," ইঁহারা "নিরাশীর্যত চিত্তাত্মা" (কামনা রহিত, এবং

চিৎ স্বরূপ আত্মাকে আত্মাতেই, অর্থাৎ কূটচ্ছে, স্থির করিয়া যতচিত্তাত্মা) ইঁহাদের একমাত্র কর্মকে গীতা বলিয়াছেন "কেবলং কর্ম" যাহার অর্থ প্রাণের কর্ম। ইঁহারাই বিমৎসরঃ (নির্বৈর)' রঞ্জনের সঙ্গে সকলে বৈরিতা করিয়াছে, সে রহিয়াছে শান্ত নির্বিকার, প্রাণের কাজ সমাধা করিয়া স্বলোকে, অমৃতত্বে শায়িত হইয়াছে। কর্মের বন্ধন তাহাকে বাঁধে নাই। রঞ্জনের মৃত্যুর তাৎপর্য্য নাকি অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। অতএব ইহারা মুক্ত ধারার অভিজিৎ বা ডাকঘরের অমলের মৃত্যুর ও নিশ্চয় কোন অর্থ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অমলের দ্বেষশূন্য সমদৃষ্টির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন কবি। যে মোড়ল অমলকে, মাধবদত্তকে শাসাইতে আসে তাহাকে ও অমল বলে - "মোড়ল মশায়, আমি মনে করতুম, তুমি আমার উপর রাগ করেছ—তুমি আমাকে ভালবাসনা। তুমি যে সত্যি রাজার চিঠি আনবে এ আমি মনে করিনি—দাও, আমাকে তোমার পায়ের ধুলো দাও।" মোড়ল রাজার চিঠি' লইয়া উপহাস করিতে আসিয়াছিল, পায়ের ধুলো দিবার মত কোন উপযুক্ততা যে তাহার ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। এই মোড়লকেও শেষে স্বীকার করিতে হয়—"না, এ ছেলেটার ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। বুদ্ধি নেই বটে কিন্তু মনটা ভালো।" কথাটা ছোট, 'ডাকঘরের', "রক্তকরবীর," "মুক্তধারার," "ফাল্গুনীর প্রত্যেকটি কথাই ছোট।" কবি কথাকে বিরল করিয়া ব্যঞ্জনার দ্বারা তাঁহার অনির্বচনীয় অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন। বিমৎসরঃ, ত্যৎক্তসর্বপরিগ্রহঃ 'অমল', অভিজিৎ, রঞ্জন অমৃত লোকে প্রয়াণ না করিয়া, দুই ভুরুর মাঝখানের চৈতন্যে শায়িত না হইয়া পৃথিবীর সদা লোভী রাবণ রাজার রাজ্যে (রব করে যে সেই রাবণ) পড়িয়া থাকিবে? অতএব রঞ্জনের মৃত্যুর তাৎপর্য যিনি বুঝেন নাই, তিনি রক্তকরবী গ্রন্থখানা বুঝিয়াছেন বলিয়া কিংবা রবীন্দ্রের কাব্যাত্মাকে বুঝিয়াছেন বলিয়া যেন অভিমান না রাখেন।

রক্তকরবীর নন্দিনী সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—"এইটি মনে রাখুন, রক্ত করবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।······রক্ত করবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়।" নন্দিনী মানবী চরিত্র সন্দেহ নাই। নন্দিনী এখন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া "শেষ মুক্তিতে" পৌছে যাই, কিন্তু "রঞ্জন" নন্দিনীর গুরু, সে মৃত্যুর মধ্যে দিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

অমল সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি, অমলকে যদি কবি বলিতে চাও আপত্তি নাই, ঘোর বাস্তববাদী বলিতে চাও তাহার ও সে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। রঞ্জন নন্দিনী, অভিজিৎ সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের চোখে না চরক শুশ্রুত বাস্তব, না উত্তর কুটের সিংহাসন বা লোহের বাঁধ। রক্ত করবীর সোনার তালের যক্ষপুরীর মধ্যে ও সত্য কোথায়? তাঁহার চোখে, একমাত্র প্রাণই সদ্বস্তু। প্রাণই, বাস্তব। 'নন্দিনী মানবী—প্রাণপ্রাচুর্যই মানবতা।

সাহিত্যের সামগ্রী

(এশিয়ার অধ্যাত্ম রাষ্ট্রের প্রহরী: এশিয়ার মহাত্মা: বিমুগ্ধ য়ুরোপের মুক্ত আত্মা রোমাঁ রোলাঁ)

"রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ—
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান ॥
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাইনে দেবী
ডাক' ক্ষণে ক্ষণে
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।

* * * * *

কর্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান—
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান ॥"

যিনি আদিতে, যিনি মধ্যে, যিনি শেষে—সেই সত্যসুন্দর অশেষের আহ্বান আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রভাত জীবনের আলো-আঁধারের কুহেলিকার মধ্যে ছিল এই আহ্বানের ইঙ্গিত--অস্পষ্ট, অব্যক্ত কিন্তু শিশু-হৃদয়সংবেদ্য। মধ্যাহ্নের প্রখরতায় তেজোময়ের আহ্বান বাজিয়াছিল ডমরু-নিনাদে, সায়াহ্নের স্তিমিত আলোয়, রাত্রির বুকের জ্যোতির্লেখায় সেই একেরই নীরব মুখর আহ্বান। সংসারে সকলের বিশ্রাম আছে, আছে সুপ্তি, বিরাম। নাই কেবল কবির—

"শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাইনে দেবী
ডাক' ক্ষণে ক্ষণে।"

বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন বিশ্বচরাচর। এ তাঁহার একলারই শিল্প। শূন্যের বুকে জ্যোতির ব্যঞ্জনা ফুটাইতে কোন সহকারীকে তিনি ডাকেন নাই। মানুষ তাঁহার অবদান ভোগ করে, যে অবদান অফুরান। কিন্তু তাঁহার রঙের তুলিটা আগাইয়া দিয়া, কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া মানুষকে তাঁহার ঋণ শোধ করিবার চেষ্টা করিতে হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, ইহা সাধারণ মানুষের কথা। কিন্তু কবির কথা স্বতন্ত্র। বিধাতার গোপন শিল্প-ভবনে সাধারণ মানুষের আহ্বান নাই। সাধারণ মানুষ আমরা, কাঙালীর দল বাহিরে ভিড় করিয়া আছি। অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছি। সেই গোপন ভবনের প্রসাদ লইয়া ঘরে ফিরিতেছি। ভিতরে এক পা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। কিন্তু অগণিত মানুষ হইতে পৃথক করিয়া বিধাতা গুটিকয় বাছা বাছা লোককে চিরকাল প্রীতিপক্ষোপাত দেখাইয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের তিনি দান করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, হাত ধরিয়া টানিয়া একেবারে তাঁহার গোপন শিল্প-সদনের ভিতরে ইঁহাদের তিনি লইয়া যান। যে কলা-নৈপুণ্য কেবল তাঁহার একলার, তাহারই খানিকটা তিনি ইঁহাদের দিয়া দিলেন, বলিলেন—তোমরাও সৃষ্টি কর। তোমাদের সৃষ্টি আমার সৃষ্টির মত আয়তনে অপরিমেয় হইবে না, কিন্তু তাহাতে কি! তোমাদের চিত্রের সীমিত পরিসরের মধ্যেও আমার শিল্পের, আমার অনুভবের, মহিমা আভাসিত হইবে। আমার অশেষ রসের ভাণ্ডটি হইতে খানিকটা ঢালিয়া লও, এই রসে সঞ্জীবিত হইলে সীমা সীমাকে ছাড়াইয়া যাইবে। আমার এক একটি নক্ষত্র, এক একটি ফুল অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু একটি ফুলের পাপড়ির ভিতর দিয়া, একটি তারার আলোক-ধারায়, ঝরিয়া পড়িতেছে না কি আমার অসীমতা ? আমার অজস্রতা ?

বিধাতার এই স্নেহানুশাসনই এই ঈশ্বরপুত্রদের জীবনকে নিয়মিত করিল। আজীবন বিধাতার দেওয়া কর্ম-ভার বহিয়া

বেড়াইতেই হইল। কোথায় বিশ্রাম?

"রাত্রি মোর শান্তি মোর রহিল স্বপ্নের ঘোর
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ।"

কবি বলিলেন – এই দুরূহ সৌভাগ্যকে বহিয়া বেড়াই ববিয়াই ত আমি কবি। আমার কাজই ত সেই অসীমের আভাস দেওয়া, তাঁহার দেওয়া রসের পরিচয় দিয়া মানব চিত্তকে সেই রসহিল্লোলে আন্দোলিত করা। যাহারা আমার মত ভাগ্যবান নহেন তাঁহাদিগকে আমার পরম সৌভাগ্যের সাথী করিয়া আমার হৃদয়কে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের হৃদয়কে আমার করিয়া সত্য শিব সুন্দরের হৃদয়ে বিলীন করিয়া দেওয়া।

"সাহিত্যে চিত্রকলায় ব্যঞ্জনাই রসের প্রধান আধার। সেই ব্যঞ্জনার মানে, কথাকে বিরল ক'রে, ফাঁকের ভিতর দিয়ে ভাবের ধারা বইয়ে দেওয়া, বাক্য ও অলঙ্কারের বিরলতার ভিতর দিয়ে যাঁরা ইঙ্গিতেই রসকে নিবিড় করেন তাঁরাই গুণী, আর যাঁদের ভাবুক দৃষ্টিতে রসে পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাঁরাই রসজ্ঞ। ভাবের মহলে যারা অর্বাচীন তারা উপকরণকেই বড় করে দেখে, সত্যকে নয়। সুতবাং উপকরণের ফাঁক তাদের কাছে সম্পূর্ণ-ই ফাঁক।............ আমরা ফাঁক মানব না। ফাঁককে মানাই নাস্তিকতা, চোখে যেখানে ফাঁক দেখি আমাদের অন্তরাত্মা সেইখানে যেন পূর্ণকে দেখে......।")

(শান্তি নিকেতন

ফাঁককে পূর্ণ কয়িয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। আকাশ আর মর্ত্যের মধ্যে ত বিরাট ফাঁক দেখিতে পাই আমরা। কবির চক্ষু দেখিল সেই দৃশ্যতঃ বিরলতার মধ্যে "পূর্ণ" অদৃশ্যভাবে আসন গাড়িয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন আভাসে ব্যঞ্জনায় এই পূর্ণকে প্রকাশ করাই ত সাহিত্য। বিরলতার মধ্যে যে অনন্তের রসমঞ্জরী ফুটিয়া রহিয়াছে তাহার চিত্রই ত শিল্পকলা।

কবির এই মত অনেকেই গ্রহণ করেন নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন অপূর্ণ অপাংক্তেয় ত নহেই বরং অপূর্ণ-ই সাহিত্যের একমাত্র

সামগ্রী। ব্রহ্মের কথা বলিবেন ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসী। আমরা সাহিত্যিক, আমাদের নায়কের মনে ছোট ছোট ভাবনা রহিয়াছে, আমাদের নায়িকার রান্নাঘরে নুন মসলা হাতা খুন্তি না থাকিয়াই পারে না। আমরা তাহাদের জীবনের আলেখ্য রচিতে বসিয়া ইহাদের ত্যাগ করিব কি করিয়া।

সাহিত্যের আসরে যাঁহারা রান্নাঘরের হাতা খুন্তি লইয়া আসেন, জীবন জিজ্ঞাসাকে জীবিকা উপার্জন মনে করিয়া মজুর-সাহিত্য, তথা হাতা-খুন্তির সাহিত্য প্রচারে কোমর বাঁধেন সেই সব ঘোর বিপ্লবীদের সঙ্গে তর্কে আমাদের রুচি নাই। তথাপি রবীন্দ্র মানসকে, রবীন্দ্রের শিল্প ধর্মকে বুঝিবার জন্য যতখানি প্রয়োজন ততটুকু আলোচনা করিব।

"যে লোক সেই ফাঁকটাকেই অত্যন্ত বেশি ক'রে সত্য জানে সেই হোলে স্বার্থপর, সেই হোলো অহংনিষ্ঠ সে বলে, ও আলাদা আমি আলাদা। মহাত্মা কাকে বলি—যিনি সেই ফাঁককে আত্মীয় সম্বন্ধের দ্বারা পূর্ণ করে জানেন। জ্যোতির্বিৎ যেমন ক'রে জানেন যে পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝখানের শূন্য পরস্পরের আত্মীয়তার আকর্ষণ সূত্র বহন করছে।"

(শান্তিনিকেতন)

আমার সমগ্র জীবনকে ঘিরিয়া যিনি বিরাজ করিতেছেন, তিনি আমার হইয়াও সকলের, সেই অনাদি অনন্তকে আভাসিত করিয়াই ছুটিয়াছে আমার কাব্য প্রবাহ। আমার কাব্যের ইহাই অদ্বৈত মূর্তি। আমি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই দেশটির নাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে যে কেবল এই কথাটাই ছড়াইয়া রহিয়াছে—

"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

ইহা ভারতের সন্ন্যাসীর বাণী, ইহাই ভারতের কবির বাণী।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ যখন আপনাকে প্রকাশ করিতেছিলেন হঠাৎ ভারতের জনারণ্য হইতে বাহির হইয়া এক অদ্ভুত দর্শন ব্যক্তি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—গুরুদেব! আপনি যে এশিয়ার অধ্যাত্মরাষ্ট্রের প্রহরী। আপনি এই কথা বলিবেন না ত কে বলিবে? আপনি আমাদের সঙ্গে, আমাদের মধ্যে আছেন; কে আমাদেব সত্যের গায়ে আঘাত করিবে? কে নিক্ষেপ করিবে ধূলি?

ইহার সঙ্গে কবির দৃশ্যতঃ কোন মিল নাই। না জীবনযাত্রার, না কর্ম্মের। ইনি ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের স্বাধীনতার যুদ্ধের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছেন। আর কবি রচিতেছেন শান্তি-নিকেতনের নিভৃতে বসিয়া চির সুন্দরের নৈবেদ্য। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। ভারতের সর্বত্যাগী, অদ্বৈতের অনুসন্ধানী সন্ন্যাসীর সঙ্গে অদ্বৈত রস-স্রষ্টা কবির যেমন অন্তরিক মিল, অদ্বৈত মানবতার প্রতিষ্ঠাতা, নিষ্কাম কর্মবীর মহাত্মার সঙ্গেও তাঁহার আত্মার গভীর সংযোগ।

"My creed is service of God and therefore of humanity. My God is myriad formed, and while sometimes I see him in the spinning wheel, at other times I see him in communal unity, then again in removal of untouchability and that is how I establish communion with Him according as the spirit moves on."

"What I want to achieve—what I have been striving and pining to achieve these thirty years, is self realisation, to see God face to face, to attain 'Mokshsa' I live and move and have my being in pursuit of this goal. All that I do by way of speaking and writing and all my ventures in the political field are directed to this same end."

যুদ্ধ করিতে আসিয়া ব্রহ্ম-সাধনা? পৃথিবীর চক্ষু বিস্ময় বিস্ফারিত হইল। কিন্তু কবি বিস্মিত হইলেন না। ইনি যে ভারতবর্ষের সেনাপতি! ভারতবর্ষের কুরুক্ষেত্রেই না গীতা রচিত হইয়াছিল?

('স্বদেশপ্রেম' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ভারতের যুদ্ধ যে চিরকালই ধর্মযুদ্ধ। ভারতের কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র। এই মহাত্মার জীবন বাণীকে উপলব্ধি করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—'মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয় তত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই যে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে; এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্য পরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানেরই অন্তর্গত। মহাভারত পাঠ যে আমাদের দেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করবার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে।......"

(মহাত্মা গান্ধী)

কেহ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাত্মাজি! আপনি নিষ্কাম কর্মবীর সন্ন্যাসী, আপনি নাকি আর্ট পচ্ছন্দ করেন না।' মহাত্মাজী বলিলেন সেকি? আমিই-ত সেরা আর্টিষ্ট! তোমরা আর্টের কি অর্থ কর জানি না। আমি ত জানি আর্ট' পরিপূর্ণ সুষমা, বিরুদ্ধতার মধ্যে সামঞ্জসের প্রতিষ্ঠা। (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ফাঁকের দীনতাকে পূর্ণের মহিমায় ভরাইয়া দেওয়া) যাহাদের তুমি সন্ন্যাসী বল তাহাদের কথা একবার ভাব দেখি। দুনিয়ার সেরা আর্টিষ্ট কি তাহারাই নয়? সর্বখর্বতাকে সর্ব অসামঞ্জসকে যাঁহারা ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র জীবন খানাকে সত্য শিব সুন্দরের মূর্তিমতী বাণীরূপে গড়িয়া তুলিতেছেন! আমার জীবনই ত সেই সেরা আর্টের বাণী।

শ্রোতা পূরাপূরি সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি বলিলেন অদ্বৈতের রসানুভূতিই যদি কেবল সাহিত্য হয়, তাহা হইলে realistic, বস্তুধর্মী সাহিত্যকে কোথায় লইয়া যাইব? ইবসেন্, বার্ণাড্‌শ,

গোর্কি, শরৎচন্দ্র এমন কি শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্টিকে কি সাহিত্য নহে বলিয়া ধরিতে হইবে? ইঁহারা কেহই অদ্বৈতের অনুসন্ধান করেন নাই, বিশ্বসৃষ্টির সানন্দ অনুভূতি ইঁহাদের সৃষ্টির উৎস ও নহে, লক্ষ্য ও নহে। ইঁহাদের সাহিত্যের উৎস মানুষের সমাজ, যে সমাজ স্বার্থপরতায় পঙ্কিল, বিরোধে খণ্ডিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, পাপে আবিল, যেখানে মানুষে মানুষে ঐক্য নাই, আছে বৈষম্য, সুষমা নাই আছে কদর্যতা, আনন্দের লেশ মাত্র নাই, আছে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের হলাহল। এই সমাজকেই যাঁহারা শিল্পের পটভূমিকারূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার সংস্কার বা ধ্বংস যাঁহাদের লক্ষ্য তাহাদিগকে কি সাহিত্যিক বলিব না? Dolls House, (ইব্‌সেন) যেখানে Noraর প্রতি, তথা সমস্ত নারী জাতির প্রতি, পুরুষের প্রচ্ছন্ন ঘৃণা ও অবহেলার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, Mrs warrens' Profession (শ') যাহার বক্তব্য বিষয় প্রায় একই—পুরুষ-সমাজের হাতে নারীর দুঃসহ নির্যাতন এবং তাহা হইতে উদ্ধারের সাধু চেষ্টা, Widower's House (শ') যেখানে দেখানো হইয়াছে মানুষের পৈশাচিক অর্থগৃধ্নুতা, Mother (গর্কি) যাহার বক্তব্য বিষয় রাষ্ট্রের অবিচার, অর্থ কৌলীন্যের হাতে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়ন আর সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত মানুষের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, Macbeth বা Othelo, যে দুইটি নাটকে সেকস্‌পীয়র মানুষের পৈশাচিক ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার হৃদয় বিদারক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বাঙ্গালার কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সমস্ত সৃষ্টি— সাহিত্যের তালিকা হইতে তাহাদের নাম কি কাটিয়া দিব? সংসারের দিকে চাহিয়া ইহাদের স্রষ্টা আনন্দের লেশমাত্র অনুভব করেন নাই, অনুভব করিয়াছেন মর্মান্তিক দুঃখ, তাঁহাদের সাহিত্য সেই দুঃসহ দুঃখানুভূতির সাহিত্য, অদ্বৈত আনন্দানুভূতির নহে, ইঁহারা পূর্ণকে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন অপূর্ণকে, ভেদকে, বৈষম্যকে। এক কথায় ইঁহারা বাস্তববাদী, অধ্যাত্মবাদী নহেন, মানুষে মানুষে ইঁহারা ফাঁককেই দেখিয়াছেন,

সেই ফাঁককে, সেই বিরলতাকে ভরাইবার মত কোন সামগ্রী কোন সুষমা খুঁজিয়া পান নাই।

এই তর্কের মীমাংসা কি ?

মীমাংসা কি সত্যই নাই ? যিনি Mrs Warren's Profession বা Widower's House অথবা যিনি Doll's House বা Ghost লিখিয়াছেন তিনি স্বীকার করিবেন না। কিন্তু তাঁহার মুখের অস্বীকৃতির মধ্যেই একটা বড় স্বীকৃতি উঁকি মারিতেছে, যাহাকে তাঁহাদের সাহিত্যের ফলশ্রুতিও বলা যাইতে পারে। ইঁহারা বলিতেছেন মানব সমাজে আমরা আনন্দ দেখি নাই, দেখিয়াছি দুঃখ, সংসারে অদ্বৈতকে দেখি নাই, দেখিয়াছি বৈষম্য। ভাল কথা। কিন্তু সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন হইতেছে বৈষম্য দেখিয়া দুঃখ অনুভব করিলেন কেন ? মানুষে মানুষে ভেদটাকে স্বীকার করিতে পারিলেন না ত ! তাহার জন্য কেহ অশ্রুপাত করিলেন, কেহ বিপ্লবের পন্থা আবিষ্কার করিলেন কেহ তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিলেন। ইঁহাদের সাহিত্য আমাদের কি শিক্ষা দিতেছে ? বলিতেছে নাকি বৈষম্য দূর কর, ভেদকে স্বীকার করিয়া লইওনা. মানুষে মানুষে, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন কর ; এ আমার, ও আমার নয় ভাবিয়া অন্যকে পীড়ন করিওনা, ভেদবুদ্ধি তোমার মনুষ্যধর্মকে হত্যা করিতেছে, তুমি পশু হইতেছ ! ইব্‌সেন কি শ,' কি গরকি এই কথা কি অস্বীকার করিতে পারেন ? বৈষম্য দেখিলে, প্রেমের অভাব দেখিলে তাঁহারা দুঃখ পান কেন ? দুঃখ পান বলিয়া ত তাঁহারা আর দুঃখবাদী নহেন। বরং চান দুঃখকে দূর করিতে, সংসারে আনন্দের প্রতিষ্ঠা করিতে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে কি তাঁহারা আনন্দবাদী নহেন ?

তাহা হইলে ব্যবধান কোথায় ?

ব্যবধান কেবল এইখানে যে রবীন্দ্রনাথ ভারতের উপনিষদের ঋষির ভাবশিষ্য বলিয়া তাঁহার-উপলব্ধির মধ্যে যে অদ্বৈত ঈশ্বরবুদ্ধি রহিয়াছে

ইহারদের তাহা নাই। এই শ্রেণীর লেখকরা ত ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাহাতে এইটুকু মাত্র ব্যবধান হইতেছে যে তাঁহাদের সাহিত্য ভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে শিক্ষা দিতেছে, সংসারে মানুষে মানুষেপ্রেম লাঞ্ছিত ও অস্বীকৃত বলিয়া কেবল পাঠকের হৃদয়ে দুঃখানুভূতি জাগাইয়া ক্ষান্ত হইতেছে আর রবীন্দ্র সাহিত্য এই সকলশিক্ষাত দিতেছেই তদুপরি পাঠককে এক অখণ্ড প্রেমের সন্ধান দিয়া এক পূর্ণের আদর্শকে হৃদয়ে উন্মেষিত করিয়া সেই হৃদয়কে উদ্বোধিত করিতেছে। তাই শ' গরকির সাহিত্যে তীব্রজ্বালা, ক্রুদ্ধ বিদ্রোহ, বিপ্লবের বাণী, রবীন্দ্র সাহিত্যে মঙ্গলময়ের ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরতা, আগামীকালের কল্যাণপ্রতিষ্ঠায়, মানুষের স্বধর্ম্মের, নিত্য প্রকৃতির পুনরুজ্জীবনে পরম বিশ্বাস। এক কথায় শ,' গরকি, ইব্‌সেন, রাসেল্‌ জাতীয় শিল্পীরা সত্য শিব সুন্দরে বিশ্বাস না করিয়াও মানব সমাজে সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, রবীন্দ্রনাথ সত্য শিব সুন্দরের সজ্ঞান অনুভব হইতেই জগতে তাহার প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করেন।

এই শ্রেণীর লেখকদের দুরবস্থা দেখিলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। একদিকে ইঁহারা জোর গলায় বলিবেন ঈশ্বর মানিনা, অতএব মানুষের চিরন্তনী অধ্যাত্ম প্রকৃতিকেও মানিনা, প্রকৃতির মধ্যে যে কোথাও সত্য আছে, মঙ্গল আছে, প্রেম আছে, সুন্দর আছে তাহা দেখিতে ও পাইনা, স্বীকার ও করিনা, সঙ্গে সঙ্গে এক নিশ্বাসে বলিতে সুরু করিবেন—ও হে মনুষ্য নামধেয় জীবগোষ্ঠি! কল্যাণের প্রতিষ্ঠা কর, পরষ্পরকে ভালবাস, একের গায়ের জোর বেশী বলিয়া অন্যের ধন প্রাণ অপহরণ করিওনা, দেহে মনে সুন্দর হও, সাম্যের ও প্রেমের সমাজ প্রতিষ্ঠা কর। কেন করিব? কি দায় আমার? আপনাদেরই মতে যখন প্রকৃতি দুর্ব্বলকে ধ্বংস করিয়া সবলকে রক্ষা করে ও সবলের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে সেই প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক মানুষ আমরা কি করিয়াই বা প্রকৃতির এই আদেশকে, এই দাবীকে অস্বীকার করিব? কথায় কথায়

সায়কলজির দোহাই দেন আপনারা অথচ সঙ্গে সঙ্গে সেই সায়কলজিকে অমান্য করিবার অসম্ভব আদেশ দিতেছেন? একদিকে বলিতেছেন প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে কেবল Life force যাহা একদিকে দুর্ব্বলকে ধ্বংস করিতেছে, আর অনবরত প্রজা সৃষ্টি করিতেছে, এই life force সুন্দর নহেন,······শান্তও নহেন, পৈশাচিক ধ্বংস ও পৈশাচিক কামুকতার অপদেবতা, তখন মানব সমাজে কল্যাণ আর শান্তির প্রতিষ্ঠার অবকাশ বা স্বাধীনতা কোথায়? এই সব প্রশ্ন বার্ণাড শ'-কে কেহ করিয়াছেন কিনা জানিনা, করিলেও তিনি যে সোজা উত্তর দিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বক্রোক্তি ও ব্যঙ্গের দ্বারা নিজের ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ কথার ইন্দ্রজাল ছড়াইয়া প্রতিপক্ষকে উপহাস ছাড়া আর কিছুই করিতেন না তাহা অনুমান করিতে পারি। বাক্‌সর্ব্বস্বতাকেই ত তিনি সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া জানেন।

শ'-র ভক্তরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে একটি ক্ষীণ জবাব আবিষ্কার করিতেও পারেন। বলিতে পারেন—'কেন, শ' কি instict এর কথা বলেন নাই? মানুষ instinct হইতেই সৎকার্য্য করিবে।

Instinct এর অর্থ সহজ-প্রকৃতি। অন্ততঃ তাহাই আমরা বুঝি। প্রকৃতির life force নিশ্চয় মানব প্রকৃতির ও মূল, অতএব মানুষের Instinct এর উৎস ও উহাই। তাহাই যদি হয় মানুষের Instinct সৎকার্য্য করিতে, কল্যাণের বা সুন্দরের ভাবনা ভাবিতে পারিবে কেন? প্রকৃতিকে বাদ দিয়া instinct আবার কোথা হইতে প্রেরণা লাভ করিবে? মানুষের instinct-ইত life force.

অত্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের এই অবস্থাই হয়। অতিবুদ্ধির খেলা দেখাইতে গিয়া শ' শেষকালে অত্যন্ত গোলে পড়িয়াছিলেন এবং অবশেষে এই instinctএর গোঁজামিল দিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভাবের ঘরে চুরি ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। Realismএর নামে, যৌক্তিকতার নামে, বিজ্ঞানের

নামে ইঁহারা যে অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক এবং ঘোর অযৌক্তিক কথার রামধনুর বর্ণমহিমায় পাঠকের মন ও দৃষ্টিকে অভিভূত করেন। পলিটিশিয়ানদের ইহা কিছুটা মানাইলেও শিল্পীকে একেবারে মানায় না। এই কথাটাই জোর করিয়া বলিবার সময় আসিয়াছে।

রবীন্দ্র সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যিকদের এই প্রগলভতার প্রতিবাদ।

আসল কথা এই যে কেবল কাদা মাটিই real নহে, মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের কামনা বিশেষ করিয়া প্রজাসৃষ্টি-প্রেরণা, ঘৃণ্য জীবিকা উপার্জ্জনবৃত্তি, দুর্ব্বলকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ইত্যাদিই কেবল real নহে। বিশ্বভুবনের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম ভুচর খেচরের মধ্যে এইগুলি রহিয়াছে, মানুষের মধ্যেও রহিয়াছে কিন্তু এইগুলি বিকৃতি,—নিত্য প্রকৃতি নহে, স্বভাব নহে, স্বধর্ম্ম নহে। ইহারা আছে বলিয়াই real কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে কেবল ইহাদেরই একচেটিয়া রাজত্ব, Totalitarian dictatorship নহে, প্রজ্ঞা-পিপাসা, অতীন্দ্রিতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, অহেতুক প্রেম এবং সেই প্রেম জনিত আনন্দানুভূতি ও বিশ্ববোধ প্রকৃতির মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান। কেবল Life force নামক উপদেবতা প্রকৃতির মধ্যে কামনার বহ্নি জ্বালাইয়া রাখে নাই, আরও একজন দেবতা আছেন যিনি বলিতেছেন সুন্দর হও, সুন্দরকে সৃষ্টি কর, অনুভব কর, উপলব্ধি কর। ইনি আছেন বলিয়াই শ' সাহিত্যিক। Life force নামক আসুরিক শক্তির হাতের ক্রীড়নক নহেন, শ' সাম্যকে ভালবাসেন, সমাজে অসাম্য ও বৈষম্য দেখিয়া ক্রুদ্ধ হন। অতএব Realism এর বিজ্ঞাপন আঁটিয়া যাঁহারা শিল্প সৃষ্টি করিবেন, মানব কল্যাণকামনা যাঁহাদের শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা, তাঁহাদিগকে বিশ্বপ্রকৃতির তথা মানব প্রকৃতির সমস্ত কথাটাই বলিতে হইবে। বলিতে হইবে তুমি পরের কল্যাণ সাধনা করিবে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিবে কারণ কল্যাণের প্রতিষ্ঠাই মনুষ্যধর্ম। সাম্যই তোমার সত্তার লক্ষ্য। পাপ হইতে

তুমি নিবৃত্ত হইবে কারণ বিধাতা তাঁহার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেককে দান করিয়াছেন। তোমার বিবেকই সেই ন্যায় দণ্ড।

সংসারে কেবল Macbeth, Iagoই real নয়, Hamlet, Bancuo ও real, Hamlet এর স্রষ্টা দুঃখ করিয়াছেন the world is out of joint কিন্তু যাঁহারা করিয়াছেন পৃথিবীকে out of joint তাঁহাদের শেষ পরাজয়ও তিনিই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দুঃখের মধ্যে জাগাইয়াছেন আশা। Hamlet কি সংসারে নাই? Hamletএর Idealism লইয়া মানুষ কি প্রাণ দিতেছেনা? Lady Macbethই বা অকস্মাৎ উন্মাদ হইলেন কেন? কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে? সেক্স্পীয়রেরই বা তাহা দেখাইবার প্রয়োজন কি ছিল? প্লটের দাবীতে নিশ্চয় নহে। Macbeth নাটকের প্লট বা আখ্যায়িকা Lady Macbeth এর মস্তিষ্কবিকৃতি দাবী করেনা। দাবী করে Lady Macbeth এর প্রকৃতি। পাপ, ষড়যন্ত্র, হত্যা, স্বভাবের বিকৃতি, এতখানি বিরুদ্ধাচরণ স্বভাব সহ্য করিতে পারেনা। সে চাহে শান্ত থাকিতে, রক্ষা করিতে, সুন্দর হইতে, সুন্দরকে সৃষ্টি করিতে। তাই কেহ যখন অন্তঃ-সত্তার এই বাণীকে একেবারে অস্বীকার করিয়া স্বভাবের বিপরীতগামী হয়, তখন তাহার Lady Macbeth এর পরিণতিই হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ের কামনাই real নহে, ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রেম, এক কথায় আধুনিক সাহিত্যিকরা যাহাকে idealism বলিয়া, romanticism বলিয়া, ধনিশ্রেণীর কল্পনা-বিলাস বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করেন তাহা তাঁহাদের কল্পিত বাস্তব হইতে ও বড় বাস্তব।

এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন অদ্বৈতের সানন্দ অনুভূতিই একমাত্র সত্য, এবং সত্যই সুন্দর, সুন্দরই শিব। আর সাহিত্য বা আর্ট হইল এই সত্য শিব সুন্দরের জয়গীতি। বিজ্ঞানের সত্যকে Artist স্বীকার করিয়া লউন তাহাতে অন্ততঃ আজকে কেহ দুঃখ করিবে না। সত্য দ্রষ্টা আর্টিষ্ট বিজ্ঞানকে ভয় করেনা। বিজ্ঞানের লক্ষ্য যদি সত্য হয়, তবে সাহিত্যেরও তাহাই। কিন্তু বিজ্ঞান

ব্যবসায়ীর যে-কোন আষাঢ়ে গল্পকে স্বীকার করিয়া ক্ষমতাশালী সাহিত্যিক realistic সাহিত্যের নামে অসত্য প্রচারে সাহায্য করিবেন এবং পৃথিবীর যত ধূরন্ধর রাজনীতি-ব্যবসায়ী তাহার সুযোগ লইয়া মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিবেন তাহা মোটেই প্রীতিপ্রদ নহে।

কোন বৈজ্ঞানিক প্রচার করিলেন হিংসাই প্রকৃতির ধর্ম। দুর্বলকে কেবল হিংসা করিতেছে "Natural selection", "Survival of the Fittest", আর কেহ বলিলেন ব্যক্তিত্ব আবার কি বস্তু, Personality নামক কোন বস্তু আছে নাকি? মানুষ নামধেয় দ্বিপদ জন্তুগুলি সকলেই ত একজাতীয়। ইহাদের মধ্যে আবার ইতর বিশেষ, স্বাতন্ত্র্য? বিবেক? আপনার ভাল আপনি বুঝিয়া নিবার স্বাধীনতা? সর্বনাশ·········· এই সবই ত ধনীশ্রেণীর চক্রান্ত। অতএব বাঁধ concentration camp, তৈরী কর গিলটিন লাখে লাখে·········ভাঙ্গ গীর্জা, মন্দির মসজিদ, বানাও ঐগুলিকে নাচঘর। Total Massএর জন্য বসাও Totalitarian ticratorship বল একক মানুষ ব্যক্তিত্ব মহিমার প্রতিভূ নহে, গড্ডলিকা প্রবাহের একটি অকিঞ্চিৎকর বুদ্বুদ, যাহাকে পিষিয়া মারিলে কোন দোষ নাই। বল সাহিত্য কোন অলীক আধ্যাত্মিকতার বাহন নহে, মানুষের জীবিকার economic necessityর জোগানদার। "চাঁদ অতি সুন্দর" বুর্জুয়া কবির এই উক্তি কাটিয়া লেখ "চাঁদ! তুমি আমার দুর্লভ রুটি, যে রুটি পৃথিবীর বুর্জুয়ারা তোমারই মত আমার হস্ত হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে"। তাহা হইলেই পূরা বাস্তব সাহিত্য, তথা মজদুর সাহিত্য সৃষ্টি হইবে।

সভ্যজগতের চোখের সামনে বিদগ্ধ বুদ্ধির এই তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে—সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রে। ইহার প্রতিবাদ করিবার মত সবল কণ্ঠ য়ুরোপ বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, যদিও য়ুরোপই এই তাণ্ডবনৃত্যে সর্বাগ্রে দলিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রতিবাদ করিয়াছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের কবি Sentinel of the East! আর করিয়াছেন ভারতের মহাত্মা। মহাত্মাই নূতন করিয়া পৃথিবীকে

শিখাইলেন—"There is no religion higher than truth or Righteousness. The highest morality is universal."

"No action can be called moral, unless it is prompted by a moral intention. The end cannot justify the means. Pure motives can never justify impure or violent action."

'Spiritual needs cannot be supplied through the intellect or through the stomach."

"No man who values his religion as also his nationalism can barter away the one for the other. Both are equally dear to him... ....

I believe that is not only morally wrong but also politically inexpedient."

"Non-violence is the greatest virtue, cowardice the greatest vice."

"Non-violence is the law of our species as violence is the law of the brute."

"The world is weary of hate, we see the fatigue overcoming the western nations.

We see that this song of hate has not benefitted humanity. Let it be the privilege of India to turn a new leaf and set a lesson to the World."

"Disobedience to the law of the state becomes a peremptory duty when it comes in conflict with the law of God."

"Our friendship becomes all the richer for our disagreements. Friends to be friends are not

called upon to agree even on most points. Only disagreements must have no sharpness, much less bitterness, about them."*

সাম্যের নামে একনায়কত্বের স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া যাঁহারা বার মাসে বাহান্নখানা ষড়যন্ত্রের মামলা আনিয়া "disagreement" এর অপরাধে আজকের বন্ধুকে কাল ফাঁসিতে ঝুলাইতেছেন, মানুষের অন্তরবাসী সহস্রশীর্ষা পুরুষকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া মানব গোষ্ঠিকে mass আখ্যা দিয়া রাষ্ট্রের ষ্টীম রোলার দিয়া সমান করিয়া দিতেছেন, কোমরে দড়ি বাঁধিয়া কনসেনট্রেশন কেম্পে পাঠাইয়া দিতেছেন, তাঁহাদের গুরু সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক, শিল্পী, যাঁহারা বাস্তবের নামে ঘোর অবাস্তব, তথাকথিত নৈসর্গিক বা দার্শনিক তত্ত্ব জগতে ছড়াইয়া আধুনিক জগতে মূর্খদের হাততালি কুড়াইয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাস্তব-অবাস্তবের যে ভ্রান্ত সীমারেখা টানিয়াছিল বিংশ শতাব্দীর জাগ্রত মানব তার শিল্পবোধ তাহাকে যদি নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া না দেয় পৃথিবীর সভ্যতার ধ্বংসের আর যতটুকু বাকী আছে তাঁহা সম্পূর্ণ হইতে বেশীদিন সময় লাগিবেনা, এবং ইহা মুছিয়া দিবার প্রধান দায়িত্ব শিল্পীদের, সাহিত্যিকদের।

ভারতের কবিগুরুর বাণী, মহাত্মার বাণী য়ুরোপে যে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে তাহার প্রমান বিমুগ্ধ য়ুরোপের একটি মুক্ত আত্মা অন্তত দিয়াছেন। আজ স্বদেশের কামান-গর্জনের মধ্যে তাঁহার কণ্ঠধ্বনি চাপা পড়িলে ও ভরসা হয় একদিন এই বাণীই য়ুরোপকে মৃত্যু হইতে ত্রাণ করিয়া অমৃতলোকে লইয়া যাইবে। 'জঁা ক্রিস্টোফার', 'সোল এনচেনটেড',-এর স্রষ্টা, মহাত্মা গান্ধী, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের জীবন চরিত রচয়িতা রোমঁা রোলঁা ইউরোপকে শুনাইয়াছেন ইঁহাদের বাণী। আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসিনী, ব্যক্তিত্বের

*মহাত্মা গান্ধীর এই বাণীগুলি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন সঙ্কলিত **Mahatma Gandhi's Sayings** পুস্তিকা হইতে গৃহীত।

অনন্ত মহিমায় আস্থাহীনা জন্মভূমিকে ডাকিয়া বলিয়াছেন ওগো বস্তুবাদিনী ! পঞ্চেন্দ্রিয়ের নর্ম সহচরী বিমুগ্ধ য়ুরোপা ! এইবার ওঠ, জাগ, তোমার অন্তরের শুভ্র রাজহংসটি তোমার পীড়নে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় নিরন্তর পক্ষ তাড়না করিয়া তোমার বক্ষের কবাট ভগ্ন করিতে চাহিতেছে, এইবার তাহাকে মুক্তি দাও, অমৃতের ছায়া পথে তাহাকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে পাখায় করিয়া সে সেই শাশ্বত জীবনের তীর্থভূমিতে লইয়া যাইবে যেইখানে পার্থিব অপার্থিবের, দূর নিকটের, অতীত ও অনাগতের সীমারেখা মুছিয়া গিয়াছে ! ওগো অতুল ঐশ্বর্যের কণ্টক-শয্যা-শায়িতা, মৃত্যু-ভয়ভীতা য়ুরোপা ! একবার বাহিরকে ছাড়িয়া ভিতর পানে দৃষ্টিপাত কর; তোমার বিদগ্ধ বুদ্ধির আণবিক বোমায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে একবার তোমার অন্তরবাসী সেই মহান্ত পুরুষকে চিনিয়া লও, যিনি

> "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
> সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং
> পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যং
> উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি।"
>
> "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো হন্তরাত্মা
> সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
> হৃদামন্বীশো মনসা ভিক্ ৯ প্তো
> য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

রলাঁর জাঁ ক্রিস্টোফারের অশেষ অতৃপ্ত প্রজ্ঞাপিপাসা অন্তর-নিবাসী এই সহস্রশীর্ষ পুরুষের অনন্ত পিপাসা। তাঁহার আঁনাত্তির অমৃত-তৃষ্ণা, স্বর্গলোক-প্রয়াণ এই বিশ্বাত্মার, এই হৃদয়সন্নিবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের অনন্ত অভিসার। ইন্দ্রিয়ের কণ্টকজর্জরিতা, বিদীর্ণ হৃদয়া আঁনাত্তির নিঃশব্দ আর্তনাদই কি আজ লবনাম্বুবারিধির ওপার হইতে ভাসিয়া আসিতেছে না ?

"পথিক কালের মর্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ,
পূর্ণতার সাথে ভেদ
মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে
এবিশ্বতো তারি কাব্য, মান্দাক্রান্তে তারি রচে টীকা
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।"
(সানাই-যক্ষ)

ভারতের কবিগুরুর এই বাণী! Sentinel of the East এর এই বাণী! "বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা" র এই আশার বাণীর বড় প্রয়োজন অদ্য পৃথিবীর; বড় প্রয়োজন মৃত্যুভীত য়ুরোপের শ্রবণ করা, যে মর্মে তাহার সেই "পূর্ণ" বাস করিতেছেন যিনি অমৃত, যিনি অবিনশ্বর। রোমাঁ রোলাঁ কবিগুরুর এই অমৃত বাণী, এই অনর্পিত ধন পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার পূর্বে বিমুগ্ধ স্বদেশবাসীর জন্য বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রের মনোভূমি পরিক্রমা আপাততঃ এইখনেই শেষ করিলাম। এই অপারভূমির প্রতিদিকে ভ্রমণ করিবার সামার্থ্য আমার নাই, কেবল সেই অনন্ত ভূমির সন্ধানটুকু দিয়াই আমি ক্ষান্ত হইলাম।

পাঠকদের নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্বে আমি কেবল বাঙ্গালার তরুণ সমাজের নিকট এই আবেদনটুকু জানাইব যে তাঁহারা যেন ঢাক ঢোল বাজাইয়া বৎসর বৎসর রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন করিয়াই ক্ষান্ত না হন, রবীন্দ্র মানসের প্রত্যক্ষ পরিচয়কে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহাদের স্বদেশের পানে একবার তাকাইয়া দেখেন, আর সেই মানসের অমৃতআলোকে পথ চিনিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হন, যেন একটি ব্যর্থ নমস্কারের মধ্যেই তাঁহাদের গুরু-পূজার অবসান না হয়।

সমাপ্ত